বিজ্ঞাপন।

স্কুল সমূহের প্রধানতম ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত এইচ্ উড্রো এম, এ, মহোদযের অনুমতি লইয়া আমি এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হই। সঙ্কলন বিষয়ে উক্ত মহাত্মার নিকট বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

অনবকাশ বশতঃ গ্রন্থখানি সর্ব্বপ্রকার দোষ শূন্য করিয়া তুলিতে পারিলাম না। স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাদি সাধারণেব বোধগম্য করিবার প্রয়াসে, সরল ভাষায় লিখিতে চেষ্টা পাইয়াছি। এই পুস্তক স্কুলের ছাত্রদিগেব পাঠ্য হইবে বলিয়া, ইহাতে বিবাহ প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় সন্নিবেশিত হইল না। স্বাস্থ্য-রক্ষা অতি কঠিন বিষয়; ইহার সমুদায় নিয়ম একত্র করিতে গেলে, গ্রন্থের আকার বৃহৎ হইয়া উঠিবে এই আশঙ্কায় কতিপয় সাধারণ নিয়ম মাত্র সঙ্কলিত হইল।

এক্ষণে পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন এই যে, কোন স্থানে ভ্রম লক্ষিত হইলে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কণকালে, সকৃতজ্ঞ-চিত্তে তাহা সংশোধন করিয়া দিব।

আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী কৃত "নরদেহ নির্ণয়" গ্রন্থ হইতে অনেক শব্দ গৃহীত হইয়াছে। কিমধিক মিতি।

কলিকাতা।
১০ই জানুয়ারি।
১৮৬৪।

শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

স্বাস্থ্য রক্ষা।

উপক্রমণিকা।

আমাদের দেশ জ্বর, ওলাউঠা প্রভৃতি ভয়ানক রোগের আবাসভুমি হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে কতশত গ্রাম এককালে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং এক্ষণেও নানা স্থান পীড়ার আতিশয্য বশতঃ বাসের অযোগ্য হইয়া যাইতেছে। কিন্তু কি কারণে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতেছে ও কি উপায়েই বা তাহাদের প্রতিবিধান হয়, তদ্বিষয়ে অনেকেই ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যে-আমরা রোগ ও মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছি তাহা অনেকেই বুঝেন না, কেহ কেহ অল্প পরিমাণে বুঝিয়াও অভ্যাস ও অবস্থা দোষে নিয়ম পালন করিয়া উঠিতে পারেন না। অনেকে বিবেচনা করেন যে আমরা ঈশ্বরের কোপানলে পতিত হইয়াছি বলিয়াই এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, কেহ কেহ বলেন যে আমাদের পুর্ব্বপুরুষেরা কোন নিয়ম প্রতিপালন না করিয়াও স্বচ্ছন্দ শরীরে দীর্ঘায়ু হইয়া কালযাপন করিয়া গিয়াছেন, অতএব আমরা

কেন নিয়মাধীন হইব? এরূপ তর্ক ভ্রম-সঙ্কুল বলিতে হইবে। অতি ভোজন, দুর্গন্ধময় বায়ু সেবন, অপরিষ্কৃত ও আর্দ্র গৃহে বাস, অতিশয় শীত বা রৌদ্রভোগ প্রভৃতি অন্যায়াচরণ করিলে, শরীরে কোন না কোন প্রকার অসুখ হইবেই হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের দণ্ড কখনই না হইবার নহে। সুস্থ ও দৃঢ়কায় ব্যক্তি যে মারিভয়াক্রান্ত স্থানে অল্পক্ষণ মাত্র অবস্থিতি করিয়া অচিকিৎস্য রোগগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা অনেকেই জানেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সকল নিয়ম পালন ও যেরূপ শারীরিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে কালাতিপাত করিতেন এক্ষণে তাহার কিছুই নাই। অবস্থা-ভেদে ও দেশাচারের পরিবর্ত্তন-ক্রমে সকল বিষয়েরই প্রভেদ হইয়া যাইতেছে। অতএব যে যে নিয়ম পালন করিয়া চলিলে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় তাহা জানা সকলেরই কর্ত্তব্য। কয়েক খান প্রসিদ্ধ ইংরাজি * গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষোপযোগী কতক গুলি নিয়ম সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক খানি সঙ্কলন করিয়াছি। ইহা পাঠ করিয়া এত-

---

Lardner's Animal Physiology
Quain's Anatomy
Mann's Manual of Physiology
Graham's Domestic Medicine
La Mert's "The Science of life."
Chambers' Preservation of Health &c &c.

দেশীয় ব্যক্তিদিগের কিছু উপকার হইলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে।

বর্ত্তমান কালে চিকিৎসা-শাস্ত্রের যে রূপ অনিশ্চিত অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে প্রায় কোন চিকিৎসকের হস্তেই শরীর সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। অনেকেই অনুপযুক্ত ও অপরিমিত ঔষধ দিয়া নানা প্রকার নূতন রোগের সূত্রপাত করিয়া থাকেন। এতদ্দেশে যে প্রাচীন চিকিৎসা-প্রণালী প্রচলিত আছে তাহার অবস্থা নিতান্ত হীন হইয়াছে, ডাক্তারদিগের মধ্যেও নানা প্রকার মতভেদ দেখা যাইতেছে। ঔষধ ব্যবস্থা করিবার সময় চিকিৎসকদিগের পরস্পরের অনৈক্য দেখা যায়। একে পীড়াই ক্লেশকর, তাহাতে আবার এরূপ চিকিৎসকদিগের হস্তে পতিত হওয়া আরও বিড়ম্বনার বিষয়। অতএব যাহাতে পীড়ার হস্তে পতিত হইতে না হয় তদ্বিষয়ে সকলকেই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

———oo———

স্বাস্থ্য রক্ষা।

প্রথম অধ্যায়

শারীর ক্রিয়া।

যে যে নিয়ম পালন করিলে শরীর সুস্থ থাকে। সেই সমুদায় উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে শারীর ক্রিয়ার বিষয় কিছু লেখা আবশ্যক। সেই সকল ক্রিয়ার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

ক্ষুধা হইলেই আমরা আহার করিয়া থাকি। খাদ্য দ্রব্য হইতে রক্ত উৎপন্ন হয়, ও সেই রক্ত সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া শরীর রক্ষা করে। কিন্তু ক্ষুধার কারণ কি, ও আহার করিলেই বা কিরূপে তাহার শান্তি হয়, তাহা জানা কর্ত্তব্য। যে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস ক্রিয়া না হইলে ক্ষণ মধ্যেই জীবন নাশ হয়, এবং যে পরিশ্রম, আমাদের সমস্ত সুখের একমাত্র সাধন, সেই দুইটী কার্য্য দ্বারাই ক্ষণে ক্ষণে শরীরের ক্ষয় হইয়া থাকে। সেই ক্ষতিপূরণ করিবার প্রয়োজন হইলেই ক্ষুধার উদয় হয়,

তখন আমরা আহার করিয়া থাকি। ভুক্ত দ্রব্য, শরীরের অভ্যন্তরে গিয়া তত্রস্থ যন্ত্র সকলের দ্বারা রক্ত রূপে পরিণত হইয়া শরীরের সর্ব্ব স্থানে সঞ্চারিত হয়, এবং ক্ষয় প্রাপ্ত অংশের পূরণ করিয়া দেয়। শরীরের যে অংশ অধিক পরিমাণে সঞ্চালিত হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ক্ষয় হইতে না হইতেই আবার তৎপ্রদেশে অধিক রক্ত যাইয়া শীঘ্র শীঘ্র তাহার পূরণ করে।

শরীর,—অস্থি, মাংস, ও চর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সে সমুদায়ই রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব শরীরের অন্যান্য অংশ যে কয়েক প্রকার ভৌতিক পদার্থে নির্ম্মিত, রক্তে সে সকলেরই সত্তা আবশ্যক। বাস্তবিক * ও তাহাই আছে। সেই নিমিত্তই রক্তদ্বারা শরীরের ক্ষতি পূরণ হইয়া

* রাসায়নিক শাস্ত্রের সাহায্যে, শুষ্ক মাংস ও শুষ্ক রক্তে, যে উপাদান যে পরিমাণে আছে, তাহা অবধারিত হইয়াছে। তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

	মাংস	রক্ত
অঙ্গার	৫১.৮৩	৫১.৯৬
উদজান	৭.৫৮	৭.২৫
যবক্ষারজান	১৫.০৩	১৫.০৭
অম্লজান	২১.৩১	২১.৩০
অন্যান্য পদার্থ	৪.২৩	৪.২৩
	১০০.০৩	১০০.০০

থাকে। রক্ত স্বীয় অংশ দ্বারা দেহের ক্ষতিপূরণ করিয়া স্বয়ং ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ভুক্ত দ্রব্য হইতে আবার রক্তের সেই ক্ষতি পূর্ণ হইয়া থাকে। আহার গ্রহণ না করিলে অল্প ক্ষণের মধ্যে রক্তের পুষ্টিকর অংশ দেহের ক্ষয়-নিবারণে নিঃশেষ হইয়া পড়ে, সুতরাং শরীর ক্রমেই ক্ষীণ হইতে থাকে, সে সময় পুষ্টিকর অন্নদ্বারা রক্তের পোষণ করিতে না পারিলে অবশেষে মৃত্যু উপস্থিত হয়।

যে আহার দ্রব্য দ্বারা রক্তের দেহ-পুষ্টিকারিতা শক্তি জন্মে, যে যে প্রক্রিয়া দ্বারা তাহার পরিপাক হয় তাহা বর্ণনা করা আবশ্যক। এক্ষণে সঙ্ক্ষেপে তাহারই কথা বলা যাইতেছে।

আমরা মুখ দ্বারা আহার গ্রহণ করি। দুগ্ধাদি কয়েক প্রকার দ্রব্য এককালে গলাধঃকরণ হয়, অন্যান্য দ্রব্য চর্ব্বণ করিতে হয়। চর্ব্বণ কালে দন্তদ্বারা পিষ্ট ও লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া গল-নালী দ্বারা অন্ন-নালী নামক পথে গমন করে। পরে উদরের কিঞ্চিৎ বামভাগে থলির ন্যায় স্থানে উপস্থিত হয়। এই স্থানকে আমাশয় কহে। আমাশয়ে ভুক্ত দ্রব্য উপস্থিত হইবামাত্র, তথা হইতে এক প্রকার প্রবল অম্লরস উৎপন্ন হইয়া উহার সহিত মিশ্রিত হয়, তাহাতেই পরিপাক হইতে থাকে। এই রসকে আমাশয়িক রস কহে।

পরে উক্ত দ্রব্য এক নলাকৃতি সুদীর্ঘ * নাড়ীতে প্রবেশ করে। ঐ নাড়ীর নাম ক্ষুদ্র অন্ত্র বা পক্বাশয়। ঐ নাড়ীতে থাকিতে থাকিতে যন্ত্র বিশেষ হইতে নিঃসৃত আরও তিন প্রকার রসের সহিত মিলিত হইলেই পাক-ক্রিয়া সমাধা হয়। আমাদের উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে যকৃৎ নামক এক যন্ত্র আছে, তাহা হইতে যে রস নির্গত হয় তাহাকে পিত্তরস কহে। উদরের বামদিগে আমাশয়ের নিম্নে আড় ভাবে অবস্থিত যে মাংস পিণ্ড আছে, তাহা হইতেও এক প্রকার রস নির্গত হয়। এই দুই প্রকার রস, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রণালী দিয়া পক্বাশয়ের এক স্থানেই উপস্থিত হয়। আর এক প্রকার রস পক্বাশয়ের গাত্র হইতেই নির্গত হয়। এই তিন প্রকার রস, আমাশয়িক রস ও লালা, ইহার মধ্যে একটীর অভাব বা অল্পতা হইলেই পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে।

যে পাঁচ প্রকার পাচক রসের উল্লেখ করা গেল, তাহাদের শক্তি একরূপ নহে। খাদ্য দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে রসবিশেষের কার্য্যকারিতা দেখা যায়। তৈলাদি পদার্থ ও মাংস পরিপাক করিতে লালার সহায়তা আবশ্যক করে না, আবার চাল, গম প্রভৃতি

* ইহা দীর্ঘে প্রায় ২০ ফীট হইবে। ইহার ব্যাস ১ ইঞ্চ হইতে ১॥০ ইঞ্চ।

লালাযুক্ত না হইলে কোন মতেই পরিপাক পায় না। মাংসাদি কতকগুলি দ্রব্য আমাশয়িক রসে জীর্ণ হয়।

ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক পাইলে তাহার সমুদায় সারাংশ আমাশয় ও পক্বাশয় সংলগ্ন অসঙ্খ্য নাড়ী দ্বারা রক্তে নীত হইয়া তাহার পুষ্টিকারিতা সম্পাদন করে।

পক্বাশয়ে পরিপাক কার্য্য নির্ব্বাহ হইবা মাত্র খাদ্যের সারভাগ দেহ পোষণ কার্য্যে ব্যাপৃত হয়, তখন অসার ভাগ প্রণালীবিশেষ দ্বারা মল রূপে নির্গত হইয়া পড়ে।

কিরূপে খাদ্যদ্রব্য পরিপাক পাইয়া রক্তে পরিণত হয় তাহা বর্ণিত হইল। এক্ষণে রক্ত কিরূপে শরীরের সর্ব্বস্থানে চালিত হইয়া প্রয়োজন মতে ব্যয়িত হয়, তাহার বর্ণনা করা আবশ্যক। এই ক্রিয়ার নাম রক্তসঞ্চালন।

আমাদের বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে বামপার্শ্বে একটী শূন্য-গর্ভ মাংস থলি আছে। তাহাকে হৃদয় বা রক্তাধার বলে। তাহা রক্ত পূর্ণ থাকে। নাড়ী বিশেষ দ্বারা তথা হইতে দেহের সর্ব্ব স্থানে রক্ত চালিত হয়। হৃদয় হইতে চালিত রক্ত, প্রথমতঃ একটী স্থূল রক্তবাহী নাড়ীতে প্রেরিত হয়, ঐ নাড়ী বক্রভাবে হৃদয়ের বাম পার্শ্বের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে গমন করিয়া, পরে নিম্নাভিমুখ হইয়াছে। ইহার নানা শাখা মস্তক, বাহু, পদদ্বয় প্রভৃতি

শরীরের সমুদায় অঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে। এই শাখা-গুলিকে ধমনী কহে। ঐ সকল শাখা হইতে আবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রশাখা বাহির হইয়া সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই গুলি এত সূক্ষ্ম যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য বিনা দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহারা কেশ অপেক্ষায় সূক্ষ্ম, এজন্য ইহাদিগকে কৈশিকা কহা যায়।

যে সকল নাড়ীর উল্লেখ করা গেল ইহাদের দ্বারা চালিত রক্ত সর্ব্বশরীরে গমন করিয়া দেহের পোষণকার্য্য নির্ব্বাহ করে। শরীরের যেখানে যে কিছু ক্ষয় হইয়াছে তাহার পূরণ ও যেখানে যাহার বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন, তাহা বর্দ্ধিত করে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৈশিকাপথে শরীরের সকল স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে, রক্তের পুষ্টিকর পদার্থ সকল ব্যয়িত হইযা যায়, ও নানা অঙ্গ হইতে স্খলিত দূষিত পদার্থ সকল ইহাতে মিশ্রিত হইতে থাকে। এই রূপে ইহার উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ কৃষ্ণ হয়। তখন ইহা আর এক প্রকার নাড়ী সমূহে নীত হয়। ইহাদিগকে শিরা কহে। কৈশিকা সমূহের সহিত শিরা সকলের যোগ থাকাতেই তাহাতে রক্ত গমন করে।

শিরা সকল প্রথমতঃ নানা শাখায় বিভক্ত থাকিয়া, কৈশিকা হইতে রক্ত গ্রহণ করিয়া, পরে দুইটী স্থূল প্রধান শিরায় মিলিত হইয়াছে। শিরাপথে ধাবিত রক্ত

এই দুই প্রধান শিরা দ্বারা অবশেষে হৃদয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে উপস্থিত হয়। হৃদয়ে উপস্থিত হইবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে খাদ্যদ্রব্যের সারভাগ আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হয়।

শিরাপথে যে রক্ত হৃদয়ে আনীত হয়, তাহাতে কয়েক প্রকার দূষিত পদার্থ থাকে। সেই সকল পদার্থ দূরীকৃত না হইলে রক্তের পোষণীশক্তি জন্মে না, প্রত্যুত তাহা শরীরে চালিত হইলে বিষ তুল্য অনিষ্টকারী হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত দূষিত রক্ত বিশোধনের উপায়ও আছে। উহা হৃদয়ের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে অসঙ্খ্য নাড়ী দ্বারা ফুস্ফুস্ নামক যন্ত্রে যাইয়া বিশোধিত হয়। ফুস্ফুস্, বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে অবস্থিত: আমরা নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করি, তাহা ফুস্ফুসে যাইয়া রক্তের সহিত মিলিত হইয়া অতি আশ্চর্য্য রাসায়নিক কার্য্য উদ্ভাবন করে। উক্ত * কার্য্য দ্বারা পুনর্ব্বার রক্তে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ উৎপন্ন হয়।

* শরীরে অম্লজান, উদজান, যবক্ষারজান, ও অঙ্গার এই কয়েক প্রকার ভৌতিক পদার্থ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। ধমনী প্রবাহিত লোহিত বর্ণ পুষ্টিকর রক্তে, অম্লজান বাষ্পের ভাগ অধিক, ও শিরাস্থ দূষিত রক্তে শরীরের স্খলিত উদজান, অঙ্গার, ও যবক্ষার মিশ্রিত পদার্থ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। অম্লজান বাষ্প ও অঙ্গার যোগে, যে দ্ব্যম্ল অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন হয়, ও যবক্ষার জান ও উদজান যোগে যে, "আমোনিয়া" বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা শিরাস্থ রক্তে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন উদজান ও অম্লজান যোগে উৎপন্ন, জলীয় বাষ্পও পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে "আমোনিয়া" ব্যতীত আর সকলেই ফুস্ফুস্ হইতে প্রশ্বাসদ্বারা বহিষ্কৃত হইয়া যায়। "আমোনিয়া" মূত্রদ্বারা নির্গত হইয়া থাকে।

তৎপরে সেই বিশোধিত রক্ত, স্বতন্ত্র নাড়ী পরম্পরা দ্বারা হৃদয়ের বাম পার্শ্বে নীত হয়, ও তথা হইতে শরীরের পোষণকার্য্যে নিয়োজিত হইতে থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে, হৃদয়দ্বারা তিনটী প্রধান কার্য্য সাধন হয়। প্রথমতঃ ধমনী-পথে সর্ব্ব শরীরে পুষ্টিকর রক্ত-চালন, দ্বিতীয়তঃ, সেই রক্তের পুনরাহরণ, তৃতীয়তঃ সেই পুনরাহরিত রক্তের বিশোধন, এই তিনটী ক্রিয়া দ্বারা আমাদের জীবন রক্ষা হয়।

অন্নপরিপাক, এরং রক্তের সঞ্চালন ও বিশোধন ক্রিয়াদি সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত হইল। এক্ষণে যে যে যন্ত্র বিশেষ দ্বারা অঙ্গ চালনা হয়, তাহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে।

পেশী নামক যন্ত্র বিশেষ দ্বারা অঙ্গ-সঞ্চালন সম্পাদিত হয়। এক এক পেশী নানা সূক্ষ্মসূক্ষ্ম সূত্রের সমষ্টি। আমরা পশু-শরীরের যে অংশ মাংস বলিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকি সে সকল পেশী মাত্র। পেশী সকল আবশ্যকমত সঙ্কুচিত হইতে পারে। ঐ রূপ সঙ্কুচিত

আমরা নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করি তাহাতে প্রধানতঃ ৭৯ ভাগ যবক্ষার জান ও ২১ ভাগ অম্লজান বাষ্প থাকে। অম্লজান বাষ্পের সংযোগে রক্তস্থ উদজান ও অঙ্গার, জলীয় বাষ্প ও দ্ব্যম্ল অঙ্গারক বাষ্প রূপে পরিণত হয়। অম্লজান বাষ্পযোগে যখন যে রাসায়নিক কার্য্য হয় তাহাতে তাপ নির্গমন হয়। তাহাতেই আমাদের শরীরের তাপ রক্ষা হয়। বিশুদ্ধ বায়ুতে যবক্ষার জান ও অম্লজান ব্যতীত, অন্যান্য বাষ্পও অতি অল্প পরিমাণে পাওয়া [illegible]

হওয়াতেই অঙ্গ-চালনা হয়। হস্ত, পদ প্রভৃতি স্থানের পেশী আমাদের ইচ্ছানুসারে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এজন্য তাহাদিগকে ইচ্ছানুগ পেশী কহে। অন্য কতকগুলি পেশী আছে, তাহারা কখনই আমাদের ইচ্ছায়ত্ত নহে, তাহাদিগকে ঈশ্বরপেশী বলে। আমাদের হৃদয় ও পাকযন্ত্রের পেশী সকল এই রূপ।

আমাদের শরীরে স্নায়ু নামক যন্ত্র আছে। পেশী সকল তাহাদের অধীন হইয়া কার্য্য করে। স্নায়ু সকল, মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড হইতে বহির্গত এবং নানা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শরীরের সর্ব্ব স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ইহাদের কার্য্য অতি বিস্ময়জনক। ইহারা শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার কার্য্যেরই সাধক। আমাদের মনে যে কোন চিন্তার উদয় হউক না কেন, তৎসমুদায়ই স্নায়ুমূল-মস্তিষ্ক দ্বারা সাধিত হয়। আমরা স্নায়ু দ্বারাই বাহ্যবস্তুর পরিচয় পাই, এবং কোন অঙ্গপরিচালন করিবার ইচ্ছা হইলে সেই ইচ্ছা স্নায়ু দ্বারাই উক্ত অঙ্গের পেশীতে সম্বেদিত হইয়া তাহাকে সঙ্কুচিত করে; তাহাতেই অঙ্গ-চালনা হইয়া থাকে। আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে হৃদয়, পাকযন্ত্র প্রভৃতির কার্য্যও স্নায়ু সকলের উপর নির্ভর করে তাহার সন্দেহ নাই। দর্শন ও শ্রবণজ্ঞান প্রভৃতি সমুদায় জ্ঞানই স্নায়ু দ্বারা উপলব্ধ হইয়া থাকে।

[খ]

যে সকল যন্ত্রের কার্য্য উল্লেখ করা গেল, তদ্ব্যতীত আরও একটী কার্য্য দ্বারা আমাদের শরীর রক্ষা হয়। আমাদের ত্বক দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন হয়। যেমন ফুস্ফুসের কার্য্য দ্বারা, শরীরের দূষিত পদার্থ সকল অনবরতই বাহির হইয়া যায়, ত্বক দ্বারাও কিয়ৎ পরিমাণে সেই কার্য্য সম্পান্ন হয়। ত্বক দ্বারা স্বেদ নির্গত হয়, তাহাতে জলীয় পদার্থ ও নানা প্রকার দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে; তাহাতেই ঘর্ম্মে এত দুর্গন্ধ হয়। চর্ম্মের অসঙ্খ্য ছিদ্র দ্বারা যেমন স্বেদ বাহির হয়, তেমনই আবার তদ্দ্বারা বায়ু ও জল প্রবেশ করিয়া রক্তের শীতলতা সম্পাদন করে।

২য় অধ্যায়।

খাদ্য।

সংসারে যত প্রকার রোগ আছে, তাহার অধিকাংশই অতিভোজন বা অনুপযুক্ত দ্রব্য ভোজন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অজীর্ণদোষে জ্বর, শূল, আমাশয়, যকৃৎদোষ, মস্তিষ্কের পীড়া, কাশ, শ্বাস প্রভৃতি রোগ হইয়া কত লোকের অশেষ ক্লেশ ও অকাল মৃত্যু হইতেছে, তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না। অতএব কিরূপ

নিয়মে আহার করা উচিত তদ্বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, আমরা যাহা আহার করিয়া থাকি, তাহার সারভাগ রক্তরূপে পরিণত হইয়া শরীরের পোষণ করে। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে, যে সকল পদার্থ দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন হইতে পারে, সেই সকল পদার্থই আমাদের খাদ্য। চাল ডাল, গম, তেল, মাচ, মাংস, আলু, দুধ, চিনি প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য আমরা সচরাচর আহার করিয়া থাকি, তৎসমুদায়ের পুষ্টিকারিতাগুণ থাকাতেই তাহারা উৎকৃষ্ট খাদ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, খাদ্য ত্রিবিধ শক্তিবিশিষ্ট না হইলে তদ্দ্বারা শরীর-পোষণ হয় না। ১ গ্লুটেন, ২ তৈল, ৩ শর্করা বা ষ্টার্চ, এই তিন পদার্থ যে যে দ্রব্যে আবশ্যকমত পাওয়া যায়, সেই সকলই আমাদের খাদ্য। গম চাল প্রভৃতি দ্রব্যের শুভ্রাংশকে ষ্টার্চ কহে। পিঙ্গলবর্ণ অংশের নাম গ্লুটেন। গ্লুটেন ও ষ্টার্চ, অল্প বা অধিক পরিমাণে অনেক পদার্থে পাওয়া যায়। মাংসে গ্লুটেন অধিক ও শস্যাদিতে ষ্টার্চ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

গ্লুটেন দ্বারা শরীরের অস্থি, পেশী প্রভৃতির ক্ষতিপুরণ হয়, ও তৈল শর্করা, বা ষ্টার্চ, নিশ্বসিত অম্লজান

বাষ্পযোগে দগ্ধ হইয়া শরীরে তাপ উদ্ভাবন করে, ও পরিশেষে জলীয় বাষ্প ও দ্বাম্ল অঙ্গারক বায়ুরূপে পরিণত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। তৈল, শর্করা, ও ষ্টার্চ এক জাতীয় পদার্থ। ইহারা সকলে তৈলরূপে পরিণত হইয়া দগ্ধ হইয়া থাকে। এবং ইহাদের কিয়দংশ দ্বারা শরীরে মেদ সঞ্চার হয়।

যে ত্রিবিধ পদার্থের কথা লেখা হইল তাহার কোনটীর অভাব হইলে শরীররক্ষা হয় না। যদি গম বা চালের গ্লুটেন বা ষ্টার্চ বাহির করিয়া লইয়া, কোন ব্যক্তিকে শুদ্ধ তাহার অবশিষ্ট ভাগ রন্ধন করিয়া খাওয়ান যায়, তাহা হইলে তাহার শরীর শুষ্ক হইতে থাকে ও পরিশেষে মৃত্যু উপস্থিত হয়। দুগ্ধ ব্যতীত এমন কোন দ্রব্য নাই শুদ্ধ যাহার উপর নির্ভর করিয়া নির্ব্বিঘ্নে শরীর-ধারণ করা যায়। দুগ্ধের অতি আশ্চর্য্য শক্তি। ইহাতে তিন প্রকার পদার্থই প্রয়োজনমতে মিশ্রিত থাকাতে মাতৃ স্তন্য-পান করিয়া শিশুগণ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শস্যাদির মধ্যে গম প্রধান। শুদ্ধ গম আহার করিয়া অনেক দিন বাচিয়া থাকা যায়, এই নিমিত্ত ইহা অনেক দেশে ব্যবহৃত। ইহাতে তৈলের ভাগ না থাকাতে আমরা ঘৃত সংযোগ করিয়া রুটী বা লুচী প্রস্তুত করিয়া থাকি।

আমাদের দেশে অপুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করিয়া

বৎসর বৎসর কত লোকের মৃত্যু হইতেছে, তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না। যে ত্রিবিধ পদার্থের উল্লেখ করা গিয়াছে, হয়ত তাহার মধ্যে ষ্টার্চ ভিন্ন আর কোন পদার্থ উপযুক্ত পরিমাণে না পাইয়া অনেক দুঃখী লোক নিতান্ত দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় হইয়া পড়ে, ও ক্রমে ক্রমে অনাহার মৃত্যুর সমুদয় লক্ষণাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। কিন্তু তাহারা পুষ্টিকর আহার পাইলে অল্পদিনের মধ্যে সবল ও সুস্থ হইয়া উঠে। এদেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও অনেকে দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস্যাদি আবশ্যকমত না খাইয়া রুগ্ন হইয়া পড়েন। আহার বিষয়ে স্ত্রীজাতির যে স্বাভাবিক লজ্জা আছে, তাহার বশীভূত হইয়া তাঁহারা সন্তানগণকে ও পুরুষ-বর্গকে সমুদায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য অর্পণ করিয়া আপনারা অতি সামান্য দ্রব্য আহার করিয়া কতই ক্লেশ পাইয়া থাকেন। ভদ্রলোকের মধ্যে অনেকে পীড়া হইতে মুক্ত হইয়া, পরে পুষ্টিকর আহারাভাবে দীর্ঘ কাল দুর্ব্বল থাকেন ও পুনঃ পুনঃ রোগাক্রান্ত হন।

দেহ ভ্রমণ করিতে করিতে রক্তের পুষ্টিকর পদার্থ শরীরের কার্য্যে বিনিয়োজিত হইয়া গেলে, নূতন পদা-র্থের আবশ্যক হওয়াতে ক্ষুধা উপস্থিত হইয়া আমাদি-গকে আহার-গ্রহণে প্রবর্ত্তিত করে। আপাততঃ বোধ-হয় যেন পাকযন্ত্রই ক্ষুধার স্থান, কিন্তু বাস্তবিক তাহা

নহে। ইহা সর্ব্ব শরীর-ব্যাপী। যদি আহার-গ্রহণ করিবামাত্র ক্ষুধাজনিত ক্লেশ এককালে দূর হইত, তাহা হইলে পাকযন্ত্রই ক্ষুধার স্থান বলিয়া বিশ্বাস হইত। উপবাসের পর আহার করিলে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বদৌর্ব্বল্য যায় না, যে পর্য্যন্ত ভুক্ত অন্নের কিয়দংশ পরিপাক হইয়া রক্তে নিয়োজিত না হয়, ততক্ষণ কোনমতেই শরীর সুস্থ হয় না।

কি পরিমাণে আহার করিলে শরীর সবল থাকে, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এবিষয়ে অভ্যাসই প্রধান; কোন ব্যক্তি অধিক খাইয়াও অনায়াসে পরিপাক করিতে পারেন; অন্য কেহ তৎপরিমাণে খাইলে তৎক্ষণাৎ পীড়িত হইয়া পড়েন। কিন্তু সচরাচর অতি ভোজন করিয়া অনেকেই ক্লেশ পাইয়া থাকেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন, যে পর্য্যন্ত উদর স্ফীত হইয়া না উঠে, ততক্ষণ আহার করা কর্ত্তব্য। এরূপ বিবেচনা মূর্খতাবশতঃই হইয়া থাকে। যাহা হউক, ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া আহার করিলে, ক্ষুধা-শান্তি হইল কি না তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। তাড়াতাড়ি করিয়া খাইলে অল্প সময়ে অধিক অন্ন উদরস্থ হয় বটে, কিন্তু তাহা হইলেই যে শীঘ্র শীঘ্র শরীর পোষণ হয় এরূপ নহে। এদেশের স্ত্রীদিগের অজ্ঞতা দোষে অতি ভোজনের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। অধিক আহার দিলে

শিশু সন্তানেরা শীঘ্র শীঘ্র সবল হইবে ভাবিয়া তাঁহারা কত অনিষ্ট করিয়া থাকেন। সকল শিশুই প্রায় উদরাময় প্রভৃতি ক্লেশকর রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে, ও অনেকে অল্প বয়সে মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া অবোধজননী-দিগকে চিরদুঃখিনী করিয়া যায়। কিন্তু মূর্খতা কি সুখের বিষয়, প্রকৃত কারণ না জানাতে তজ্জন্য তাঁহারা কোন অনুতাপই অনুভব করেন না। শৈশবাবস্থায় অতি ভোজন অভ্যাস হইলে আমাদের স্থিতিস্থাপক পাকস্থলির আয়তন বৃদ্ধি হওয়াতে, প্রয়োজনাতিরিক্ত আহার না করিলে আর তৃপ্তি বোধ হয় না; সুতরাং যত বয়োবৃদ্ধি হয় ততই অপরিমিত আহারে প্রবৃত্তি জন্মিয়া যায়। যাহারা মাতৃ ক্রোড়ে এরূপ দোষাকর ব্যবহারে দীক্ষিত হয় তাহাদেব বাঁচিবার উপায় কি?

অতিভোজনজনিত রোগের উপবাসই এক-মাত্র ঔষধ। উপবাস করিলে বা আহারের পরিমাণ কমাইয়া দিলেই রোগ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। এই সহজ উপায় অবলম্বন না করিয়া অনেকে নানা-প্রকার ঔষধ খাইয়া থাকেন; কিন্তু রোগের প্রকৃত কারণ উপস্থিত থাকাতে তাহাতে তাদৃশ উপকার হয় না। এরূপ অবস্থায় ঔষধ-সেবন কেবল অতি ভোজনের সহা-য়তাই করিয়া থাকে। কেহ কেহ অতি ভোজনের

অনুরোধে সুরা, সিদ্ধি প্রভৃতি মাদকদ্রব্য খাইয়া কত অনিষ্টপাত করিয়া থাকেন, তাহা বলা যায় না।

আমরা যথেচ্ছাচারী হইয়া আহার করিলে অপকার হইবে, তাহার বিশিষ্ট কারণই দেখা যাইতেছে। যে কয়েকটী শারীরিক রসের সহিত মিলিত হইয়া অন্ন পরিপাক হইয়া থাকে, সেই সকল রস প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, সুস্থ শরীরে প্রত্যহ প্রায় এক পাইন্ট লালা ও ৩ পাইন্ট আমাশয়িক রস নির্গত হয়; ইহাতে যে পরিমাণের দ্রব্য পরিপাক করা যাইতে পারে, তাহার অধিক হইলে ভুক্ত দ্রব্য দীর্ঘ কাল উদরে থাকিয়া পাকযন্ত্র প্রপীড়িত করে বা উদরাময় বমন প্রভৃতি রোগ জন্মাইয়া দেয়। দেখা গিয়াছে, পীড়া কালে আহার করিলে তাহা কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত ভাবে উদরে অবস্থিতি করে। এজন্য পীড়াকালে আহার বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

আমাদের শরীরের যে অঙ্গ যত চালনা করা যায়, তাহা তত শীঘ্র ক্ষয় হইয়া থাকে, এই ক্ষতিপূরণ জন্য দেহস্থ রক্ত তদভিমুখে অধিক পরিমাণে ধাবিত হয়। আহার করিবামাত্র পাক-স্থলির কার্য্যারম্ভ হইয়া তত্রস্থ পেশী সমূহ দুর্ব্বল হইতে পারে। তখন তাহাদিগকে সামর্থ্য প্রদান করিবার নিমিত্ত তৎপ্রদেশে রক্তের

প্রবল গতি হয়। কোনমতে এই গতির ব্যাঘাত হইলে পরিপাক কার্য্যেরও ব্যাঘাত হইয়া উঠে। অতএব আহারকালে বা তাহার অব্যবহিত পরে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিলে অঙ্গ বিশেষে বা মস্তিষ্কে রক্তের অধিক আবশ্যক হওয়াতে, তাহা পাকযন্ত্রে গমন করিতে পারে না, সুতরাং তাহাতে পরিপাক কার্য্যও সুন্দররূপে হয় না। আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে পরিশ্রম করিলে রক্ত যে সকল অঙ্গের ক্ষতিপূরণে নিযুক্ত থাকে, তাহা হইতে সহসা পাক-যন্ত্রে ফিরিয়া আসিতে পারে না, সুতরাং পূর্ব্বমত অনিষ্ট হয়*। অতএব আহার করিবার আদ ঘণ্টা পূর্ব্বে ও পরে ও আহার কালে কোন পরিশ্রম না করিয়া কেবল আমোদ প্রমোদ করা কর্ত্তব্য। মন প্রফুল্ল থাকিলে নির্ব্বিঘ্নে শারীরিক কার্য্য সকল নির্ব্বাহ হইতে থাকে।

খাদ্য দ্রব্য পরিপাকের উপযুক্ত করিবার জন্য আমরা রন্ধন করিয়া থাকি। কাঁচা চাল সহজে পরিপাক হয় না, কিন্তু ভাত অনায়াসে পরিপাক করা যায়। রন্ধন

---

* এই যুক্তি অনুসারে আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে স্নান করাও অন্যায়। স্নান ও গাত্র মার্জ্জনা করিলে রক্তের গতি ত্বগভিমুখে হয়। সেই রক্ত পাকস্থলিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে স্নানজনিত সুখানুভব হয় না, প্রত্যাবৃত্ত না হইলে ভাল পরিপাক হইতে পারে না।

দ্বারা খাদ্য-দ্রব্যের ষ্টার্চ শর্করাসদৃশ হইয়া উঠে, গ্লুটেন কোমল হয় ও তৈল জমাট হইয়া যায়। পক্ব আম্র প্রভৃতি কয়েকটী ফল রন্ধন না করিয়াও খাওয়া যায়, কারণ তাহারা পূর্ব্বেই সূর্য্য-পক্ব হইয়া থাকে।

আমরা প্রথমতঃ রন্ধন ও পরে দন্ত দ্বারা পেষণ করিয়া পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকি। পেষণ করিবার সময় অন্নের সহিত লালা মিশ্রিত হইয়া তাহার অনেক রূপান্তর করিয়া থাকে। ষ্টার্চ বিশিষ্ট দ্রব্য সকল লালা সংযোগে শর্করার ন্যায় হইয়া থাকে, তাহা স্বাদ দ্বারাই অনুভব করা যায়। অতএব রন্ধনকালে অন্ন যাহাতে অপক্ক না থাকে, ও চর্ব্বন সময়ে যাহাতে সুন্দর রূপে পিষ্ট ও লালা মিশ্রিত হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। যাহারা তাড়াতাড়ি করিয়া ভোজন করে, তাহাদিগকে এবিষয়ে গুরুতর অপরাধী বলিতে হইবে।

পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্যই রন্ধনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাতে এত কারীগিরী উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে যে তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। রন্ধন সময়ে এলাচি, মরিচ, শরিষা, দারুচিনি, পলাণ্ডু প্রভৃতি নানা মসলা অধিক পরিমাণে খাদ্যে সংযুক্ত হইয়া তাহার গুণের এত প্রভেদ করিয়া ফেলে যে, আর সহজে পরি-

পাক করা যায় না। অধিক পরিমাণে খাইলে পিপাসা উপস্থিত হয় ও পাক-যন্ত্রের অভ্যন্তর প্রপীড়িত হইয়া নানা রোগের উদয় হইয়া থাকে। পলান্ন প্রভৃতি ঘৃত মসলা যুক্ত দ্রব্য এতদ্দেশে অধিক পরিমাণে সহ্য হইবার নহে। যাহারা স্থূলকায় ও দুর্ব্বল, অধিক মসলা খাইলে তাহাদেরই কেবল অপকার হয় না। অধিক পরিমাণে ঘৃত বা তৈল যুক্ত দ্রব্য ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড, গ্রীণল্যাণ্ড প্রভৃতি মেরু সন্নিহিত দেশে বিশেষ উপকারী। সেখানে ইহা দ্বারা যেমন সহজে শারীরিক তাপ রক্ষা ও শীত নিবারণ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। ভাত দ্বারাই এতদ্দেশীয় লোকের শরীরের তাপ রক্ষা হইতে পারে। তেল বা চিনি অধিক খাইলে এদেশে গাত্র জ্বালা রোগ উপস্থিত হয়।

৯. আমরা মাংস ভোজন না করিয়া অনায়াসে দীর্ঘজীবী হইতে পারি। যে সকল দ্রব্য আমাদের খাদ্য, তৎসমুদায়ে প্রয়োজনীয় গ্লুটেন ও ষ্টার্চ পাওয়া যায়, সুতরাং মাংস না খাইলে শরীর-রক্ষার কোন ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু সময় বিশেষে মাংস খাওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। যখন রোগ দ্বারা শরীর শীর্ণ হয়, তৎকালে অল্প পরিমিত দ্রব্যে অধিক পুষ্টিকর পদার্থ আছে এরূপ খাদ্য মনোনীত করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধ ও মাংস ভিন্ন আর কোন দ্রব্যের দ্বারা এই প্রয়োজন সাধন হয় না। উদরা-

মল বা অম্লের পীড়া থাকিলে দুগ্ধে অপকার ভিন্ন উপকার হইবার সম্ভাবনা নহে, এরূপ স্থলে মাংসই এক মাত্র অবলম্বন। কিন্তু আমাদের দেশে যে কুৎসিৎ প্রণালীতে মাংস রন্ধন করা হয়, তাহাতে পীড়িত ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, সহজ শরীরেও পরিপাক করা কঠিন হয়। শল্য বা সিদ্ধ মাংসই রোগীর পথ্য; মসলা ও ঘৃতযুক্ত হইলেই গুরুপাক হয়।

আমাদের দেশে, মাংস ভোজনের বিশেষ প্রয়োজন নাই; কিন্তু শীতপ্রধানদেশে ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত। মনুষ্যের অসভ্যাবস্থায় পশু-মাংসই প্রধান জীবনোপায়। সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে অন্যান্য দ্রব্য করতলস্থ হয়, তখন মাংসের ব্যবহার কমিয়া আসে।

যাহারা অনুক্ষণ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করেন মাংস তাহাদের পক্ষে মহোপকারী। ইহাদ্বারা যত শীঘ্র দেহের ক্ষতি-পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন হয় তত আর কিছুতেই হয় না। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না বলিয়াই শাস্ত্রকর্ত্তারা তাহাদিগকে মাংস খাইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন এরূপ অনুভব হয়।

অধিক মসলাযুক্ত দ্রব্য খাইতে গেলে আর একটী দোষ হইয়া থাকে। মসলার অনুরোধে অনেকে অপরিমিত ভোজন করিয়া বসেন। এরূপ করা নিতান্ত অন্যায়।

অম্ন, আচার, আত্রমত্ত্ব প্রভৃতি দ্রব্যেরও এই রূপ দোষ দেখা যায়।

কিন্তু অধিক মসলাযুক্ত দ্রব্য খাওয়া অবৈধ বলিয়া, স্বাদগন্ধ-শূন্য মৃত্তিকাবৎ দ্রব্য আহার করাও অন্যায়। যাহা খাইতে অনিচ্ছা হয় তাহা পরিপাক করা কঠিন হয়।

প্রত্যহ এক দ্রব্য খাইলে আহারে অরুচি হয়, এবং শরীরে যে সকল পদার্থের প্রয়োজন তাহাও পাওয়া যায় না, এজন্য মধ্যে মধ্যে খাদ্য পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা তিথি বিশেষে যে যে দ্রব্য খাইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, বোধ করি তাহার উদ্দেশ্যই এই।

খাদ্য দ্রব্য নিতান্ত শীতল বা উষ্ণ হইলে পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে, ও তাহাতে পাকযন্ত্র সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

পরিপাক কার্য্য সংপূর্ণ হইতে অন্ততঃ ৪ঘন্টা কালের প্রয়োজন। কিন্তু কেহ কেহ ২। ৩ ঘন্টা অন্তর কিছু কিছু আহার করিয়া থাকেন। উক্ত রূপ করাতে পাক-যন্ত্র সকল বিশ্রামাভাবে দুর্ব্বল হইয়া যায়। পরি-পাকান্তে ২ ঘন্টা কাল বিশ্রাম পাইলেই পাকযন্ত্র সকল পুনরায় সতেজ হইয়া উঠে। অতএব একবার আহার করিলে অন্ততঃ তাহার ৬ ঘন্টা পরে দ্বিতীয়বার আহার

করা উচিত। প্রাতঃকালে ১০ টার সময় খাইলে বৈ-কালে ৪ টার সময়, ও রাত্রিকালে ১০ টার সময় খাওয়া উচিত। নিদ্রাকালে পরিপাক হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। এজন্য পর দিন ১০টা পর্য্যন্ত অনাহারী থাকিলে ক্লেশ হয় না। দিবসে আহারান্তে নিদ্রা যাওয়া নিতান্ত অন্যায়। তাহা হইলে অজীর্ণ দোষ হয়। এরূপ হইলে যে পর্য্যন্ত সুন্দর রূপ ক্ষুধার উদ্রেক না হয়, তাবত কাল অনাহারী থাকা উচিত।

চাল, ডাল, দুধ, মাচ, মাংস প্রভৃতি আহার করিতে পাইলে, প্রত্যহ, শুষ্কদ্রব্য এক সেরের অধিক রন্ধন করিয়া খাইবার প্রয়োজন হয় না। যাহারা দুর্ব্বল, ও যাহাদিগকে পরিশ্রম করিতে হয় না, তাহারা অনেক কম পরিমাণে খাইলেই, তাহাদের শরীর রক্ষা হইতে পারে। প্রত্যহ ৩ বারে দেড় পোয়া চালের ভাত, এক পোয়া ময়দার লুচী বা রুটী, দুই ছটাক ডাল, ও আদসের দুধ খাইলেই স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য থাকিতে পারে। অধিক পরিশ্রম করিতে হইলে, ডালের পরিবর্ত্তে এক পোয়া মাংস খাইলে চলিতে পারে। পরিশ্রম ও বয়স ভেদে আহারের পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে।

কয়েক প্রকার ডাল, মাচ, ও তরকারী আমাদের দেশে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এসকল দ্রব্য

রন্ধন দ্বারা সুন্দররূপে সিদ্ধ না হইলে পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। অনেকে অপক্ক ডাল বা তরকারী খাইয়া কত রোগ ভোগ করিয়া থাকেন। দুর্ব্বল শরীরে ডালের ঝোল খাওয়া উচিত।

তরকারীর মধ্যে কয়েক প্রকার আলু সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পটল, বার্ত্তাকু প্রভৃতির হরিদংশ কখনই পরিপাক হয় না, অতএব রন্ধন করিবার পূর্ব্বেই তাহা পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর। আমরা যে সকল শাক ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাতে প্রায়ই সারাংশ নাই, এজন্য তৎসমুদায়ই পীড়াদায়ক। তিক্তরস বিশিষ্ট যে যে শাক খাইতে হয়, তাহার কাত খাইয়াই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

শাকজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে কপি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এতদ্দেশে অতি অল্প লোকেই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সিম, লাউ, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি রোগী ব্যক্তির পক্ষে নিষিদ্ধ। যে যে তরকারীতে হরিদংশ ও জলীয় ভাগ অধিক, তাহা ব্যবহার করিলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

আমরা যে কয়েক প্রকার মৎস্য খাইয়া থাকি তন্মধ্যে রোহিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যে যে মৎস্যে তৈল বা জলের ভাগ অধিক তাহাতে অপকার ভিন্ন উপকার নাই। তৈল অধিক থাকিলে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়, ও জলীয়ভাগ অধিক হইলে শরীরের উপকার হয় না। ক্ষুদ্র মৎস্য রোগীদিগের পক্ষে অনিষ্টকর নহে। ইহাতে

তৈলের ভাগ অধিক না থাকাতে সহজে পরিপাক হয়। পচা মাচ রোগের মূলীভুত, ইহা নিতান্ত নিষিদ্ধ। মাচ, জল হইতে তুলিবার ১২ ঘন্টা পরে অনিষ্টকর হইয়া উঠে।

আমরা অনেক দ্রব্য তৈল দিয়া ভাজিয়া খাই। যে দ্রব্য সিদ্ধ করিলে অনায়াসে পরিপাক করা যায়, ভাজিলে তাহা উগ্র হইয়া উঠে। অতএব দুর্ব্বল শরীরে ভাজা জিনিষ খাওয়া অবৈধ।

দধি, অম্ল প্রভৃতি দ্রব্য সুস্থ শরীরে অল্প পরিমাণে খাইলে অপকার হয় না। লেবু, তেঁতুল প্রভৃতিতে বরং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অধিক পরিমাণে খাইলে নানা রোগ উপস্থিত হয়। জ্বর বিশেষে লেবু মহোপকারী।

অধিক পরিমাণে মিষ্টান্ন ভোজন করিলে পীড়া হয়। যাহাদের অজীর্ণ রোগ ও অম্লের পীড়া আছে, ইহা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। সহজ শরীরে অল্প পরিমাণে খাইলে উপকার ভিন্ন অপকার হয় না।

ফলের মধ্যে বেল মহোপকারী। ইহা অল্প পরিমাণে মধ্যে মধ্যে খাওয়া উচিত। আম্র, রম্ভা প্রভৃতি অধিক পরিমাণে খাইলে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু সুস্থ শরীরে অল্প করিয়া খাইলে, ইহাতে উপকার ভিন্ন অপকার

নাই। সুস্থ শরীরে নারিকেল, পেঁপিয়া প্রভৃতিও উপকারী। কোমল নারিকেল সহজেই পরিপাক হয়।

দুগ্ধোৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ঘৃত সর্ব্ব প্রধান, ইহা অনেক কার্য্যেই লাগিয়া থাকে। ছানা সহজে পরিপাক হয় না। সর ঘৃতের রূপান্তর মাত্র। ইহা অল্প পরিমাণে খাওয়াই উচিত। পীড়িতাবস্থায় এ সমুদায় নিষিদ্ধ। উত্তাপ দ্বারা ক্রমে শুষ্ক করিলে দুগ্ধ হইতে ক্ষীর উৎপন্ন হয়। ইহা অধিক খাইলে পীড়া হয়।

হংস প্রভৃতি কয়েকটী পক্ষীর ডিম্ব অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভাজা বা সিদ্ধ করিতে নিতান্ত কঠিন হইলে, ইহা গুরুপাক হইয়া উঠে। কিন্তু ৫ মিনিট কাল মাত্র অত্যুষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া খাইলে, অতি সহজে পরিপাক হয়।

এতদ্দেশীয় জলখাবারের মধ্যে মুড়ি ও ভাজা চিড়ে অতি লঘু। ইহা অন্যান্য দ্রব্য অপেক্ষা সহজে পরিপাক হইতে পারে। দীর্ঘকাল রাখিলে বা জলসংযুক্ত হইলে ইহা অনিষ্টকারী হইয়া উঠে। নারিকেল সহকারে খাইলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই। মুড়্কি প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য মুড়ির ন্যায় সহজে পরিপাক হয় না।

এতদ্দেশীয় পিষ্টকাদি প্রায়ই অনিষ্টকর। কিন্তু সুস্থ শরীরে অল্প পরিমাণে খাইলে বিশেষ পীড়াদায়ক হয় না।

অন্নমণ্ড, যবমণ্ড প্রভৃতি, দুর্ব্বল ও পীড়িত শরীরে বিশেষ উপকারী। অনেকে পীড়াকালে এ সকল খাইতে সঙ্কুচিত হইয়া, ভ্রমবশতঃ ডুমুর, পটল প্রভৃতি খাইয়া পাকস্থলিকে দূষিত করিয়া ফেলেন।

৩য় অধ্যায়।

পানীয়।

মনুষ্য শরীর যে যে উপাদানে নির্ম্মিত, তন্মধ্যে জলই প্রধান। যে রক্ত প্রবাহিত হইয়া শরীরের ক্ষতি পূরণ করে তাহার অন্যূন ৭/৮ ভাগ বিশুদ্ধ জলমাত্র। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে আমাদের সমুদায় শরীরের ২/৩ ভাগ বিশুদ্ধ জল মাত্র। শরীরে যে পরিমাণে জল থাকিলে নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত শারীরিক কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, কোন কারণবশতঃ তাহার অল্পতা হইলেই আমাদের পিপাসা উপস্থিত হয়, তাহাতেই আমরা জল পান করি। জল পান করিলে সেই পিপাসা নিবারণ হয়, তখন শারীরিক কার্য্য সকল অব্যাহতরূপে চলিতে থাকে। পীপাসা-কালে জল না পাইলে যে ভয়ানক ক্লেশ হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন।

ফলতঃ অনাহারে বরং কয়েক দিন জীবিত থাকা যায়, কিন্তু জলপান না করিলে অতি ত্বরায়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। যাহারা প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া অনশনে জীবন ত্যাগ করে, পিপাসাই তাহাদিগকে সমধিক যাতনা দেয়; এমন কি, তাহাদের তৎকালোক্ত কাতর-বচন শুনিয়া পাষাণ হৃদয়ও আর্দ্র হয়। এমত সময়ে তাহারা বৃষ্টির জলবিন্দু পাইয়াও সতৃষ্ণ নয়নে জিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক তাহাই পান করিয়া ও তাহাতে শয়ন করিয়া, কত তৃপ্তি অনুভব করে তাহা বর্ণনাতীত। এরূপ অল্প পরিমাণে জল পাইয়াও কয়েক দিবস পর্য্যন্ত মৃত্যু হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। বাস্তবিক জল যে জীবন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে তাহা অপ্রাকৃত নহে।

আমাদের ত্বক্, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতির কার্য্যদ্বারা নিয়তই শরীর হইতে জল বহির্গত হইতেছে। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে এই সকল কার্য্য অতি শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদিত হয়, সুতরাং গ্রীষ্মকালে অধিক জলপান করিতে হয়। আমরা স্নান করিলে ত্বকের অসঙ্খ্য ছিদ্র দ্বারা শরীরে জল প্রবিষ্ট হয়, তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে পিপাসা নিবারণ হয়।

আমরা যে সকল দ্রব্য আহার করি, তৎসমুদায় পাকযন্ত্রে অবস্থিতি কালে দ্রবীভূত হইয়া শরীরে শোষিত হয়। শরীরে জলীয় পদার্থের অল্পতা হইলে অন্ন

দ্রবীভূত হইতে পারে না, সুতরাং পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে। জল যেমন দ্রাবক এমন আর দেখা যায় না। অজীর্ণ দোষ হইলে উপযুক্ত পরিমাণে জলপান করিলে যে বিলক্ষণ উপকার হয় তাহার বিশেষ কারণ এই।

পিপাসা হইলেই জলপান করা উচিত। যে পরিমাণে পান করিলে পিপাসা শান্তি হয়, তাহার অধিক খাইলে পীড়া দায়ক হয়। কিন্তু অতিভোজন যেমন অনিষ্টকারী, অতিপান তত দোষাবহ নহে। অতিরিক্ত জলীয় ভাগ অতি শীঘ্রই ঘর্ম্মাদি দ্বারা বহিষ্কৃত হইয়া যায়; কিন্তু ঘর্ম্মাদির আতিশয্য বশতঃ ক্লেশ হইয়া থাকে।

ক্ষুধা সময়ে, যেমন ধীরে ধীরে আহার করিলে ক্ষুধা শান্তি হইল কি না, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়, সেই রূপ পিপাসা হইলে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া জল খাইলে পিপাসা নাশ হইল কি না, অনায়াসে তাহার উপলব্ধি হয়। যেমন আহার করিবা মাত্র ক্ষুধাজনিত ক্লেশ যায় না, সেই রূপ জলপান করিবা মাত্র পিপাসাও অন্তর্হিত হয় না। যে পর্য্যন্ত পীতবারির কিয়দংশ শরীরের কার্য্যে নিয়োজিত না হয়, ততক্ষণ পিপাসা-জনিত ক্লেশ অন্তর্হিত হইবার নহে।

যখন পরিশ্রম করিতে করিতে ঘর্ম্ম-নিঃসরণ হয়,

তৎকালে শীতল জলপান করা অবৈধ। ঘর্ম্ম-নিঃসরণ-কালে, ত্বগভিমুখে রক্তের গতি হয়। শীতল জলপান করিলে, সহসা সেই গতির ব্যাঘাত হয়, তাহাতে ত্বগভি-মুখে ধাবিত রক্ত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, হৃদয়, ফুস্‌ফুস বা পাকযন্ত্রে গমন করিয়া তাহাদের পীড়া উৎপাদন করে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে ভুক্ত অন্ন, কয়েক প্রকার শারীরিক রসের সহিত সংমিলিত হইয়া জীর্ণ হয়। কোনরূপে এই সংমিলনের ব্যাঘাত হইলে, পরি-পাক কার্য্যের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিয়া থাকে। আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে বা আহারকালে অধিক জল খাইলে, পাচক রস-সকল জল-সংযোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তখন তাহা-দের দ্বারা সুন্দর রূপে পরিপাক হয় না। এজন্য তৎ-কালে অধিক জলপান করা নিষিদ্ধ।

কোন উষ্ণ দ্রব্য পান বা ভোজন করিবার অব্যবহিত পরে শীতল জল খাইলেও অনিষ্ট হয়। উষ্ণ দ্রব্য খাইলে, সমুদায় শারীরিক কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে, ঘর্ম্মাদি নিঃসরণও হয়, এরূপ সময়ে শীতল জলপান করিলে ত্বক্ বা পাকযন্ত্রাভিমুখে ধাবিত রক্ত, সহসা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র বিশেষে গমন

করিয়া, পীড়া দায়ক হইতে পাবে। এই নিয়ম না বুঝিয়া অনেকেই কফ, কাশ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

যে জল আমাদের শরীর রক্ষার একটী প্রধান সাধন, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা প্রায়ই বিশুদ্ধাবস্থায় পাওয়া যায় না। অনেক স্থানেব লোকেই, পঙ্কিল, তৃণলতা-পূর্ণ, বৃক্ষাচ্ছাদিত, পূতি গন্ধ-বিশিস্ট পুষ্করিণীর জলপান করিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। কোন কোন গ্রামেব নিকটে নদী বা বীল আছে তাহাব জলও অপকৃস্ট। এরূপ জলে, নানা প্রকার দূষিত পদার্থ মিশ্রিত থাকাতে তাহা পীড়াদায়ক হয়। ইহা শোধন করিবারও সহজ উপায় আছে। প্রথমতঃ, ইহা সুন্দর রূপে উত্তপ্ত করিলে, তাপ-সংযোগে ইহার কয়েক প্রকার দূষিত বাষ্প বহিষ্কৃত হয়। তৎপরে সামান্য অঙ্গার-চূর্ণ-পরিপূর্ণ কলসীতে ঢালিতে হয়। কলসীর তলায় একটী ছিদ্র রাখিয়া, তাহার নীচে একটী পাত্র স্থাপন করিলে প্রায় নির্ম্মল জল পাওয়া যাইতে পারে। ইহার দূষিত পদার্থ সকল অঙ্গার দ্বারা আকৃস্ট হইয়া থাকে। কিন্তু অঙ্গার দিয়া বিশোধন করিলে জলের স্বাদের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইয়া উঠে। অবশেষে ব্লটিং কাগজ বা মোটা কাপড়ের উপর ঢালিলে, ইহার অপরিষ্কৃত অংশ প্রায়ই তাহাতে সংলগ্ন হইয়া থাকে। তখন সেই জল পান করিলে, আর পীড়া হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

যে নদী বা পুষ্করিণীর তলা বালুকাময়, ও যাহাতে সর্ব্বদা বায়ু ও রৌদ্র লাগিয়া থাকে, এরূপ স্থানের জল প্রায়ই বিশুদ্ধ। কিন্তু স্নান ও গাত্র মার্জ্জনকালে তাহাতে নানা প্রকার দূষিত পদার্থ যোজিত হইয়া তাহাকে পীড়াদায়ক করিয়া ফেলে। যে নদীতে স্রোত আছে তাহার জলই উৎকৃষ্ট, কিন্তু বর্ষাকালে তাহাতে নানা পদার্থ মিশ্রিত হয়। তখন পূর্ব্বোপায়ে বিশোধন না করিলে তাহা পীড়াদায়ক হইতে পারে। কোন কোন নদী সমুদ্র-সন্নিহিত। তাহাদের জল ব্যবহার্য্য নহে।

এক্ষণে এদেশের অনেকে আর জলপান করিয়া পরিতৃপ্ত হন না। ইংরাজ জাতির সংসর্গ-দোষে তাঁহারা সুরাসক্ত হইতেছেন। যে সকল মহৎগুণে ইংরাজেরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্টতর হইয়াছেন, যাহার প্রভাবে তাঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে মাননীয় হইয়াছেন, তৎ সমুদায়ের অনুকরণে অসমর্থ হইয়া অনেকে তাঁহাদের জঘণ্য সুরাসক্তিরই অনুচর হইতেছেন। সুরাপানে ইংলণ্ডে যে সকল মহানিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিযাও তাঁহারা ইহা হইতে পরাঙ্মুখ হন না। সুরাসক্ত ব্যক্তিরা সকল প্রকার কুক্রিয়া করিতেই উদ্যত। যদি কেহ নরাকৃতি পশু দেখিবার অভিলাষ করেন, তাহা হইলে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর কলিকাতা নগরীর লালবাজার প্রভৃতি

স্থানে গমন করিয়া ইংরাজ গোরাদিগকে দেখিলেই পূর্ণ-মনস্কাম হইবেন। যে সকল কার্য্যে মনুষ্য নামের অবমাননা হয়, তৎসমুদায়ই সুরাসক্ত লোকের সাধ্য। অল্পকালের মধ্যেই এদেশের কত বিদ্যা-বুদ্ধি-বিশিষ্ট উদার স্বভাব ব্যক্তি সুরাপান করিয়া কাল-কবলে পতিত হইয়াছেন, ও কত জন কত গর্হিত ক্রিয়া করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না। এক্ষণে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যে সুস্থ শরীরে সুরা বিষতুল্য। ইহা পান করিলে, নানা প্রকার অচিকিৎস্য রোগ উপস্থিত হয়। উদরাময়, যকৃৎ রোগ শ্বাস, কাশ প্রভৃতি ভয়ানক রোগ-পরম্পরা অতি অল্প কালের মধ্যেই দেখা দেয়, ও পরিশেষে প্রবল হইয়া জীবন হরণ করে। ইংলণ্ড প্রভৃতি শীত প্রধান দেশে এই সকল ফল কিছু বিলম্বে হয়, কিন্তু এতদ্দেশে অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রবল হইয়া উঠে।

তৈলাদি পদার্থের ন্যায়, সুরা ও ফুস্‌ফুসে গমন করিয়া দগ্ধ হইয়া থাকে, তাহাতে তাপ উদ্ভাবন হইয়া শরীর উত্তপ্ত হয়। ইহার দাহনকালে, রক্তস্থ দূষিত পদার্থ সকল, উচিত পরিমাণে সংশোধিত ও বহিষ্কৃত হইতে পারে না সুতরাং তাহা রক্তেই থাকিয়া যায়, সেই রক্ত দেহ-পরিভ্রমণ করিয়া, সর্ব্ব প্রথমে মস্তিষ্ক, পরে অন্যান্য যন্ত্রের বিকৃতি জন্মিয়া দেয়, তাহাতেই মাতালেরা বিবেক

শক্তি-বিহীন হইয়া পড়ে। তখন শীতক্রিয়া প্রভৃতি সন্তর্পণ করিলে, তাহারা অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইতে পারে।

দীর্ঘকাল সুরাপান করিলে, মুখশ্রী অপকৃষ্ট হইয়া যায়, শরীর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়, চক্ষুদ্বয় সততই রক্তবর্ণ থাকে, নাসিকাগ্র লোহিত বর্ণ ও স্ফীত হয়, ও অজীর্ণ দোষ উপস্থিত হয়। অন্ত্র, যকৃৎ প্রভৃতি পাকযন্ত্রের বিকৃতি জন্মে, তাহাতে নানা বলবৎ রোগ হয়। কোন কোন ব্যক্তি সুরাপান করিয়া আসন্ন মৃত্যু মুখেও পতিত হন। দেহস্থ রক্ত, অতি প্রবলবেগে মস্তিষ্কে ধাবিত হইয়া, তত্রস্থ শিরা বা ধমণী বিশেষকে ছিন্ন করিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রাণ হরণ করে।

এদেশে সুরা ব্যতীত, আরও নানা প্রকার মাদক দ্রব্য প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে সিদ্ধি, আফিং, গাঁজা ও চরস প্রধান। এই কয়েকটীর যোগে নানা প্রকার মাদক প্রস্তুত হয়। এ সমুদায়ই অনিষ্টকারী; ইহাদের বশীভূত হইলে নানা রোগ ও অকাল মৃত্যু হইয়া থাকে।

পীড়া হইলে চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে সকল প্রকার মাদক দ্রব্যই গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু চিকিৎসকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ মাদকপ্রিয়, যে অনেক পীড়াতেই অবৈধ পরিমাণে তাহাই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এরূপ লোকের কথায় বিশ্বাস করা কোন-

মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। কত ব্যক্তি পীড়াকালে মাদক সেবন আরম্ভ করিয়া, অল্প দিনের মধ্যে ভয়ানক মাদকাসক্ত হইয়াছেন, ও পরিশেষে নানাবিধ পাপপঙ্কে পতিত হইয়া ইহলোক হইতে অকালে প্রস্থান করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। অতএব পীড়া কালেই বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। যাহারা মাদক সেবনে একান্ত রত, তাহারা প্রথমতঃ পীড়ার অনুরোধেই এরূপ বিষভক্ষণ অভ্যাস করিয়াছেন। পরে জীবন পরিত্যাগও শ্রেয়স্কর বিবেচনা করেন, তথাপি মাদক ত্যাগ করিতে পারেন না।

৪র্থ অধ্যায়।

বায়ু।

খাদ্য বা পানীয় অভাবে কয়েক দিবস জীবন ধারণ করা যাইতে পারে, কিন্তু বায়ু-রোধ হইলে ক্ষণকাল মধ্যে মৃত্যু উপস্থিত হয়। যাহারা জলমগ্ন হয় বা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে, বায়ুর অভাবেই তাহাদের মৃত্যু হইয়া থাকে। কখন কখন বায়ুর পরিবর্ত্তে, অন্য কোন কোন বাষ্প গ্রহণ করিলেও মৃত্যু হইয়া থাকে। যে অঙ্গার

দাহন করিয়া আমরা রন্ধনাদি করিয়া থাকি, তাহাতে বায়ুস্থ অম্লজান বাষ্পের যোগে, এক ভয়ানক প্রাণ-নাশক বাষ্প উৎপন্ন হয়। ইহাকে দ্ব্যম্ল অঙ্গারক বাষ্প কহে। ইহা নিশ্বাস দ্বারা শরীরে গৃহীত হইলে, প্রথমতঃ নানা প্রকার অসহ্য ক্লেশ, ও অল্পকাল মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ইহা গ্রহণ করিয়া আত্মঘাতী হইয়াছেন, ও ইহাতে ক্রমে ক্রমে যে রূপে নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের বিবরণ পাঠ করিলে চিত্ত স্তম্ভিত হয়।

দ্ব্যম্ল অঙ্গারক বাষ্পের যে অপকারিণী শক্তির উল্লেখ করা গেল, তাহা আবার আমাদের শরীরেই উৎপন্ন হইতেছে। নিশ্বাস দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিলে, উহার অম্লজান বাষ্প সমুদায় শরীরস্থ অঙ্গারে, উক্ত বাষ্পরূপে পরিণত হয়, তখন তাহা শরীরে থাকিলে বিষতুল্য হইবে বলিয়াই, ফুসফুস হইতে প্রশ্বাস দ্বারা বহিষ্কৃত হইতে থাকে। কোন কারণ বশতঃ তাহা বাহির হইতে না পারিলে শরীরেই থাকিয়া যায়, তাহাতে অপকার হইয়া উঠে। বায়ু অভাবে আরও একটী দুর্ঘটনা হয়। দূষিত রক্তে যে অঙ্গারের ভাগ থাকে, তাহাতে নিশ্বাস দ্বারা বায়ু সংযোগ না হইলে, তাহা আর বহিষ্কৃত হইতে পারে না, সুতরাং রক্তের সহিত শরীরের সর্ব্বস্থানে

চালিত হইয়া তাহাকে বিকৃত করিয়া ফেলে। এরূপে প্রতি মিনিটে দেড় রতি পরিমিত অঙ্গার রক্তে যোজিত হইতে থাকে; সেই রক্ত মস্তিষ্ক প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া প্রথমতঃ সংজ্ঞাহরণ ও ৫।৬ মিনিটের মধ্যে জীবন শেষ করিয়া ফেলে। বায়ু অভাবে এইরূপেই মৃত্যু হইয়া থাকে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে বিশুদ্ধ বায়ুর ২০০০ ভাগের একভাগ দ্ব্যম্ল অঙ্গারক বাষ্প, কিন্তু প্রশ্বাস দ্বারা ফুসফুস্ হইতে যে বায়ু নির্গত হয়, তাহার ২০০০ ভাগে ১০০ ভাগ উক্ত বাষ্প পাওয়া যায়। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে প্রশ্বাস দ্বারা যে বায়ু বাহির হয়, তাহা পুনর্বার গ্রহণ করা অনুচিত। পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিলে তাহাতে অশেষ ক্লেশ ও মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সময়ের অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ অনেকেই অবগত আছেন। অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে বহু লোক একত্রিত হওয়াতে, কয়েক ঘণ্টা গত হইতে না হইতে ১৪৬ জনের মধ্যে ২৩ জন ভিন্ন আর কেহই জীবিত ছিল না। ইহারা, পুনঃ পুনঃ প্রশ্বসিত বায়ু গ্রহণ করিয়া, যে ভয়ানক যন্ত্রণা পাইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

গৃহের বাহিরে সর্ব্বদা বায়ু সঞ্চরণ করিতে থাকে। এরূপ স্থানে বহু সঙ্খ্যক লোক সমাগত হইলে কোন ক্ষতি

নাই; কারণ বায়ুযোগে প্রশমিত অঙ্গারক বাষ্প ইত-স্ততঃ চালিত হইয়া যায়। কিন্তু গৃহমধ্যে বা আবৃত স্থানে অধিক লোক একত্রিত হইলে, নানা অনিষ্ট ঘটি-য়া থাকে। আমাদের বাসগৃহ যে কদর্য্য প্রণালীতে নির্ম্মিত, তাহাতে বায়ু সঞ্চালনের উপায় নাই, হয়ত বায়ু প্রবেশের পথই থাকে না। একে গৃহাদি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, তাহাতে আবার রাত্রিকালে অনেকে একগৃহে শয়ন করিয়া থাকেন। গৃহে হয়ত জানালা নাই, থা-কিলেও তাহার সম্মুখে কড়ু জানালা না থাকাতে, বায়ু গমনাগমন হয় না। গ্রীষ্মকালে গবাক্ষাদি খোলা থাকে, তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু শীতকালে তাহার কোন উপায়ই থাকে না। অভ্যাস দোষে এরূপ গৃহে বাস করাতে কোন উপস্থিত কষ্ট দেখা যায় না বটে, কিন্তু তাহাতে নানা রোগের সঞ্চার হইয়া থাকে।

আমাদের বাসগৃহ প্রশস্ত হওয়া উচিত। প্রশস্ত গৃহে ২।৩ জন বাস করিলে কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করা সকলের পক্ষে সহজ নহে। সঙ্কীর্ণ গৃহে বাস করিতে হইলে, অন্ততঃ তাহার চারিদিকের দেয়ালের ঊর্দ্ধ ও অধঃ দিগে ৮টী ছিদ্র রাখা উচিত। ছিদ্র, দীর্ঘে ৪ ইঞ্চ ও প্রস্থে ৪ ইঞ্চ হইলেই তদ্দ্বারা দূষিত বায়ু বহির্গত ও বিশুদ্ধ বায়ু প্রবিষ্ট হইতে

পারে। প্রশ্বসিত দ্বাম্ল অঙ্গারক বাষ্প, বায়ু অপেক্ষা ভারী, এজন্য ইহা ভূতলে অবস্থিত হয়। ত্বক্ প্রভৃতি দ্বারা অন্যান্য যে সকল বাষ্প নির্গত হয়, তৎসমুদায় বায়ু অপেক্ষা লঘু এজন্য তাহারা ছাতের দিকে গমন করে। দেয়ালের ঊর্দ্ধ ও নিম্নভাগে ছিদ্র থাকিলে উভয় প্রকার বাষ্পই বাহির হইয়া যাইতে পারে।

তৃণ, লতা, ও মৃত পশ্বাদির শরীর, জল বায়ু ও রৌদ্রযোগে নিয়তই পচিয়া যায়, তাহাতে নানা প্রকার বাষ্প উত্থিত হইয়া বাহ্য বায়ুকে অনুক্ষণ দূষিত করে। অসহ্য দুর্গন্ধ দ্বারা আমরা মধ্যে মধ্যে এই সকল অনিষ্টকর পদার্থের অস্তিত্বের পরিচয় পাইয়া থাকি, কিন্তু কখন কখন তাহারা ইন্দ্রিয় বিশেষের অগ্রাহ্য থাকিয়াও, রোগ মৃত্যু ও শোক-জনিত হাহাকার ধ্বনি বিস্তার করিয়া থাকে। আর্দ্র ও জলাকীর্ণ ভূমিতেই এই সকল ভয়ানক পদার্থ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন ও অনিষ্টকারী হয়, তাহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমাদের দেশে যে সকল স্থানে মারীভয় হইয়াছে, তাহার অনেক গ্রামই স্রোত বিহীন নদী বা বীলের সন্নিহিত, অথবা তত্তৎ গ্রামে দুর্গন্ধময় পুষ্করিণী ও গর্ত্তের সংখ্যা অধিক। মারীভয়ের প্রকৃত কারণ কি তাহা নির্দ্দেশ করা সহজ নহে, কিন্তু আর্দ্র ও জলাকীর্ণ স্থানে বাস ও

শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে যে তাহার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

এদেশের অনেক প্রাচীন গ্রামেই বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়; অনেক স্থানে গৃহাদি নিতান্ত পরস্পরের সন্নিহিত থাকিয়া বায়ুরোধ করে। এই সকল কারণে পীড়ার আতিশয্য হইবারই সম্ভাবনা।

দিবসে রৌদ্র পাইলে বৃক্ষাদির পত্র হইতে অম্লজান বাষ্প নির্গত হয়, কিন্তু রাত্রিকালে তৎপরিবর্ত্তে অঙ্গারক বাষ্প বহির্গত হইয়া থাকে। অতএব গৃহের অভ্যন্তরে বা নিকটে পুষ্প বৃক্ষশাখা বা লতাপত্রাদি রাখিলে, বায়ুকে কিয়ৎ পরিমাণে দূষিত করিতে পারে। রাত্রিকালে বৃক্ষতলে বাস করিলে অপকার হয় জানিয়া, এতদ্দেশীয় শাস্ত্রকর্ত্তারা তাহা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

দুর্গন্ধময় পয়ঃপ্রণালী, গর্ত্ত প্রভৃতিতে লবণ বা পাথরিয়া চূণ নিক্ষেপ করিলে, এক প্রকার রাসায়নিক কার্য্য উপস্থিত হয়; তাহাতে দূষিত পদার্থ সকল রূপান্তরিত হইয়া যায়। পীড়িত ব্যক্তির বাসগৃহে, নানা প্রকার দুর্গন্ধময় ও দূষিত বাষ্প উদ্ভূত হইয়া তত্রস্থ বায়ুকে অনিষ্টকর করে; তখন, লবণ বা পাথরিয়া চূণে জল মিশাইয়া, গৃহের সকল স্থানে বিক্ষিপ্ত করিলে, ও

গৃহের চতু[illegible] অঙ্গার, লবণ বা চূণ রাখিয়া দিলে, গৃহের বায়ু [illegible] দোষ থাকে না।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যোদয়ের কিয়ৎক্ষণ পরেই গৃহে প্রত্যাগমন না করিলে, প্রখর রৌদ্র ভোগে পীড়া হইতে পারে এজন্য [illegible] অতি প্রত্যুষে বায়ুসেবনার্থে বাহিরে যাওয়া উচিত। বৈকালে রৌদ্রের হ্রাস হইলে বাহির হইয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালেই প্রত্যাবৃত্ত হওয়া উচিত। শীতকালের প্রাতঃকালে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতে কিঞ্চিৎ বেলা হইলে অধিক ক্লেশ হয় না। সন্ধ্যাকালে বা সন্ধ্যার পর বাহিরে থাকিলে, শিশির ভোগ করিয়া পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

৫ ম অধ্যায়।

পরিচ্ছন্নতা।

শরীর সর্ব্বদা পরিষ্কৃত না থাকিলে, কোনমতেই স্বাস্থ্য-রক্ষা হয় না। আমাদের ত্বক্‌দ্বারা যে সকল দূষিত পদার্থ অনবরত বাহির হইতেছে, তাহা কোন রূপে শরীরে থাকিয়া গেলে রোগ জন্মিতে পারে। ত্বকের

অসঙ্খ্য ছিদ্র দ্বারা ঘর্ম্ম-নিঃসরণ হয়, তাহাতে যে সকল পদার্থ নির্গত হয়, তাহার কিয়দংশ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়, অবশিষ্ট ভাগ কঠিন হইয়া শরীরে লগ্ন হইয়া থাকে। শরীরের মল দূর করাই স্নান ও গাত্র মার্জ্জনার উদ্দেশ্য।

প্রত্যহ প্রত্যূষে স্নান করা কর্ত্তব্য। রাত্রি কালীন বিশ্রামান্তে শরীর সবল ও সুস্থ থাকে, সুতরাং শীতল জলে স্নান করিলেও শীত জনিত কষ্ট হয় না, এবং শীত ভোগ করিলেও কাশ ও সর্দ্দি প্রভৃতি যে সকল রোগ হইয়া থাকে তাহা হইতেও পার পাওয়া যায়। ক্রমে শীত সহ্য হইয়া উঠে এবং শরীর সবল হয়। কার্ত্তিক মাস, ও চৈত্র বৈশাখ মাসে এদেশীয় অনেকে প্রাতঃস্নান করিয়া থাকেন। এই কয়েক মাস ঋতু পরিবর্ত্তন কাল। যাহারা প্রাতঃস্নান করিয়া থাকেন তাহাদিগকে প্রায়ই সুস্থ-কায় দেখা যায়। আমাদের দেশের শাস্ত্র কর্ত্তারা কত বিষয়েই যে অসামান্য বুদ্ধি শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

স্নান কালে শরীরে শীতল বায়ু লাগিলে যাহাদের অসুখ বোধ হয় তাহাদের পক্ষে গৃহের অভ্যন্তরে স্নান করাই কর্ত্তব্য। স্নান কালে অনবরত গাত্র মার্জ্জনা করা উচিত তাহাতে অঙ্গ-চালনা হইয়া সুখানুভব করা যায়।

শীতল জলে স্নান করা উচিত বটে; কিন্তু যখন

পরিশ্রম করিয়া বা রোগের প্রাদুর্ভাবে, শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন উহাতে অনিষ্ট ঘটিতে পারে। এরূপ স্থলে উষ্ণ জলই প্রসিদ্ধ। শ্রম করিয়া যখন ঘর্ম্ম-নিঃসরণ হয়, তৎকালে শরীরে শীতলজল বা বায়ু লাগিলে, তৎক্ষণাৎ ঘর্ম্ম-রোধ হওয়া নানা পীড়া উৎপাদন করে।

উষ্ণজলে স্নান অভ্যাস করা নিতান্ত অবিবেচনার কর্ম্ম। উহাতে শরীর দুর্ব্বল হইতে থাকে, অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হয়; এবং কোন কারণ বশতঃ অল্প শীত বা শিশির ভোগ করিলেই পীড়া জন্মিয়া যায়। শরীরের স্বাভাবিক আবরণই ত্বক্। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া উষ্ণজল ব্যবহার করিলে উহাতে আর প্রকৃত রূপে শরীরের আবরণের কার্য্য হয় না: তখন ফ্লানেল প্রভৃতি কৃত্রিম আবরণ দ্বারা শরীর রক্ষা করিতে বাধ্য হইতে হয়।

স্নানান্তে, শুষ্ক মোটা কাপড় বা তোয়ালে দিয়া, গাত্র মার্জ্জনা করিলে শরীরের স্বাভাবিক তাপ উদ্ভাবিত হয়। অন্যান্য সময়েও গাত্র মার্জ্জনা করা উচিত। প্রত্যহ অন্ততঃ তিন বার এরূপ করা উচিত। রাত্রিকালে শয়ন করিবার পূর্ব্বে, ভাল করিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিলে শরীর পরিষ্কৃত হয়, ও তৎকালে যে অল্প ব্যায়াম হয়, তাহাতে সুনিদ্রার বিলক্ষণ সুবিধা হইয়া উঠে।

স্নানের পর, আর্দ্রবস্ত্র ধারণ করিলে পীড়া হয়।

তাহার যে ভাগ শরীরে সংলগ্ন থাকে, তাহার জলের কিয়দংশ শরীরের উত্তাপে বাষ্প হইতে থাকে। কোন তরল পদার্থ বাষ্প হইবার সময় নিকটবর্ত্তী পদার্থ হইতে তাপ হরণ করে। শরীর-লগ্ন-বস্ত্রের জলদ্বারাও এই কার্য্যটী হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাতে শরীরের তাপ নষ্ট করে। যে প্রদেশের তাপ হৃত হয়, তত্রত্য রক্ত, স্থানভ্রষ্ট হইয়া অন্য কোন অঙ্গে গমন করিলে পীড়াদায়ক হয়।

হস্ত পদাদি অপরিষ্কৃত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ধৌত ও শুষ্ক কাপড় দিয়া মার্জ্জিত না হইলে, পীড়া হইবার সম্ভব। রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে এই রূপ করা উচিত। যদ্যপি শীতল জল সহ্য হইলে, মোজা ব্যবহার করিবার প্রয়োজন কমিয়া যায়।

আমাদের দেশের অনেকেই মলিন বসন পরিধান, ও অপরিষ্কৃত শয্যা ও আসনে শয়নোপবেশনাদি করিয়া থাকেন, এরূপ করাতে শরীরে নানা প্রকার মলাসংযুক্ত হয়, সুতরাং তাহাতে পীড়া হইয়া থাকে।

সর্ব্বদা এক বস্ত্র পরিধান করিতে গেলে তাহা পরিষ্কৃত থাকে না, অতএব গ্রীষ্মকালে প্রত্যহ অন্ততঃ ২ বার ও শীতকালে ১ বার বস্ত্র পরিত্যাগ করা উচিত। রোগ হইলে ৩।৪ বার ঐরূপ করা আবশ্যক হয়। পরিধেয় বস্ত্র সপ্তাহে দুইবার রজকগৃহে পাঠান উচিত।

আমাদের শয্যা প্রত্যহ রৌদ্রে দেওয়া, ও সপ্তাহে

অন্ততঃ একবার শয্যাবস্ত্র পরিবর্ত্তন করা, আবশ্যক। নতুবা তাহা অপরিষ্কৃত হইয়া উঠে।

সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিলে, মন প্রফুল্ল থাকে, অপরিষ্কৃত থাকিলে নিস্তেজ হইয়া যায়। প্রফুল্ল চিত্তে সকল কার্য্যই করা যায় বিষণ্ণ ভাবে অতি প্রীতি-কর বিষয়েও বিরক্তি জন্মে।

যাহারা সর্ব্বদা অপরিষ্কৃত থাকে, তাহাদের নানা প্রকার অসহ্য ও ঘৃণিত চর্ম্মরোগ হইয়া থাকে। তাহা-দের শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিতেও ঘৃণা বোধ হয়।

অন্য লোকের বস্ত্র পরিধান ও শয্যায় শয়ন করা অন্যায়, তাহাতে নানা প্রকার সংক্রামক রোগ জন্মিতে পারে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

পরিধেয়।

নিতান্ত শীতল বা উষ্ণ বায়ু শরীরে লাগিলে ক্লেশ হইয়া থাকে, তাহা নিবারণার্থে আমরা বস্ত্রদ্বারা শরীর আবৃত করিয়া রাখি। কার্পাস, রেশম, পশম প্রভৃতির সূত্রে যে বস্ত্র নির্ম্মিত হয়, আমরা সচরাচর তাহাই ব্যব-

হার করিয়া থাকি। কার্পাস অপেক্ষা রেশম ও পশমের অধিক অপরিচালকতা গুণ আছে; ইহাদের দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত থাকিলে, বাহিরের তাপ শরীরে প্রবেশ করিতে, ও শরীরের স্বাভাবিক তাপ বহির্গত হইতে পারে না। এজন্য শীতকালে রেশম ও পশমের অধিক পরিমাণে ব্যবহার দেখা যায়।

যখন অতিশয় শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, তৎকালে শরীর সুন্দর রূপে আবৃত না রাখিলে, শারীরিক তাপ ক্রমে ক্রমে বাহির হইয়া পড়ে; তাহাতে প্রথমতঃ রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া স্থগিত হয়, ও পরিশেষে মৃত্যু হইতে পারে। এদেশে শীত অতি অল্প; কিন্তু রুশিয়া প্রভৃতি দেশে শীতের এত প্রাদুর্ভাব যে তত্রত্য অসংখ্য লোক আবশ্যকমত শীতবস্ত্রের অভাবে সহসা মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া থাকেন। এদেশে শীতকালে অনাবৃত শরীরে থাকিলে, সহসা মৃত্যু হয় না বটে; কিন্তু তাহাতে নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগ পরম্পরা উপস্থিত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে কার্পাস-সূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহার করিলেই শীত নিবারণ হইতে পারে। যাহারা নিতান্ত দুর্ব্বল, কার্পাসের উপরি রেশম বা পশমের কাপড় ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। নিয়ত পশমী কাপড় ব্যবহার করাতে, নানা দোষ ঘটে। যাঁহারা ইংরাজ জাতির অণুকরণে একাগ্র-

চিত্র, তন্মধ্যে অনেকেই ফ্লানেল আদি পশমী কাপড় সততই শরীরে ধারণ করেন; ইহা একবারও মনে করেন না, যে ঐ সকল কাপড় ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রচণ্ড শীত নিবারণ জন্য। এক্ষণে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে সেখানেও ইহা তাদৃশ প্রয়োজনীয় নহে। অন্যান্য বস্ত্রের নীচে, ফ্লানেল ধারণ করিলে ত্বকের শীত সহ্য করিবার যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, তাহার অনেক হ্রাস হইয়া আসে; ক্রমে এরূপ হইয়া উঠে, যে ক্ষণেক কাল ফ্লানেল পরিত্যাগ করিলেই, কফ, কাশ প্রভৃতি পীড়ার উদ্রেক হয়।

আমরা যে প্রণালীতে ফ্লানেল ব্যবহার করি, তাহাতে আরও একটী দোষ জন্মে। ইহা শরীর-সংলগ্ন থাকিলে, অল্প ক্ষণের মধ্যেই অপরিষ্কৃত হইয়া উঠে; অপরিষ্কৃত হইবা মাত্র, অন্যতর বস্ত্র পরিধান করা উচিত। কিন্তু, আমরা তাহা করিতে পরাঙ্মুখ হই, সুতরাং অপরিচ্ছন্নতা দোষে যে সকল রোগ হইবার সম্ভাবনা, ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায়ই দেখা দেয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, এতদ্দেশে ষ্টকিং-ব্যবহার ছিল না, বরং পদদ্বয় অপরিষ্কৃত হইলে তৎক্ষণাৎ শীতল জলে ধৌতকরা রীতি ছিল। কিন্তু এক্ষণে অনেকেই ষ্টকিং পরিধান করিতেছেন, এবং কেহ কেহ নিদ্রা কালেও ইহা পরিত্যাগ করেন না। এরূপ করাতে পদ-

দ্বয় এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া যায়, যে কোন প্রকারে শী-তল বায়ু বা জল সংযুক্ত হইলেই, শরীরে রোগ উপস্থিত করে। এ দেশে যাঁহারা মধ্যে মধ্যে শীতল জলে পদধৌত করেন, ও প্রত্যূষে শীতল জলে স্নান করেন, ষ্টকিং ও ফ্লানেল ক্রয় করিতে তাঁহাদিগকে প্রায়ই বাধ্য হইতে হয় না।

এক্ষণে এতদ্দেশের পুরুষেরা যে সকল বস্ত্র ব্যবহার করেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা শীতের হস্ত হইতে মুক্তি পাই-তেছেন, কিন্তু দুর্ভাগা স্ত্রীলোকেরা শীত বস্ত্রাভাবে অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে সাটী পরিধান করেন তাহাই তাঁহাদের একমাত্র বস্ত্র; শিল্প নৈপুণ্য দোষে তাহাও আবার এত সূক্ষ্মসূত্র-বিনির্ম্মিত হইতেছে, যে তদ্দ্বারা না দেহাবরণ, না শীত নিবারণ হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ভদ্র-জাতির স্ত্রীলোকেরা যেরূপ বস্ত্র পরিধান করেন, তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক উত্তম। এতদ্দেশে তদ্রূপ কোন উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

বর্ষা ও শীতকালের রজনীতে, আবশ্যকমত গাত্র বস্ত্র ব্যবহার না করিয়া, এ দেশের অনেকে নানা রোগগ্রস্ত হইয়া থাকেন। এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত।

রাত্রিকালে বাহিরে গমন করিতে হইলে, অপেক্ষা-

জন্য অধিক বস্ত্র ব্যবহার করা বিধেয়। এ বিষয়ে অমনোযোগ করিয়া অনেকেই রোগগ্রস্ত হন।

রৌদ্রে বেড়াইতে হইলে, শুভ্রবস্ত্রাবৃত ছত্রদ্বারা মস্তকাদি আবৃত রাখা, এবং তৎকালে শুভ্রবস্ত্র পরিধান করা আবশ্যক। শুভ্র পদার্থে সূর্য্যের তাপ লাগিবা মাত্র তাহা তৎক্ষণাৎ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র সকলে তাপ শোষণ করে; এজন্য তাহারা নিতান্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে।

---

৭ ম অধ্যায়।

বাসগৃহ।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, বাসস্থান প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হওয়া উচিত। অবস্থা দোষে অনেকে প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারেন না; কিন্তু যে সকল ব্যক্তির বিলক্ষণ সঙ্গতি আছে, তাঁহারাও এ বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া বৃথা ক্লেশ পাইয়া থাকেন। তাঁহারা চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ প্রস্তুত করিয়া, বায়ু গমনাগমনের পথ এককালে রুদ্ধ করিয়া ফেলেন।

এদেশে সচরাচর উত্তর ও দক্ষিণদিগ্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। যাহাতে উক্ত দুইদিগ্ হইতে নির্ম্মল

বায়ু সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহার উপায় করা উচিত। উত্তর ও দক্ষিণের দিকে, ঋজু জানালা রাখিয়া দেওয়া, ও জানালার সম্মুখে বায়ু গমনের প্রতিবন্ধক না থাকে এরূপ কোন উপায় করা, সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শীত-কালে উত্তরের জানালা, দিনমানে খোলা রাখিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বন্ধ করা উচিত।

নির্ম্মাণ-প্রণালী দোষে, অনেক ইষ্টকালয়ের নীচের ঘর প্রায়ই আর্দ্র থাকে, এরূপ ঘরে মধ্যে মধ্যে চুণ ফিরান ও মেজেম করা উচিত। মেজেতে আল্‌কাত্‌রা দিলে, অপেক্ষাকৃত শুষ্ক হইয়া উঠে। বস্তুতঃ এরূপ ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অপেক্ষা কোন কোন মৃত্তিকা-নির্ম্মিত গৃহ অনেকাংশে প্রশংসনীয়।

শুষ্ক ও পরিষ্কৃত স্থানেই গৃহ নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। যে স্থানে অব্যাহত রূপে রৌদ্র ও বায়ু সঞ্চরণ করে, যেখানে নিম্ন ভূমি নাই, এরূপ স্থান মনোনীত করা উচিত। রুক্ষ বা জলাকীর্ণ স্থানে কোনমতেই বাস করা উচিত নহে। বাটীর নিকট এরূপ পয়ঃপ্রণালী রাখা উচিত, যাহাতে অনায়াসে বৃষ্টির জল বাহির হইয়া যাইতে পারে।

যে পথ দিয়া গমনাগমন করিতে হয়, তাহাতে জল বা কর্দ্দম থাকিলে পদদ্বয় সম্পূর্ণরূপে আর্দ্র হয়। তাহাতে জ্বর, কফ, কাশ প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে। এজন্য

পথের জল বাহির করিবার জন্য, পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করা নিতান্ত আবশ্যক।

এ দেশের অনেকেই গৃহের নিকটে দুর্গন্ধময় গর্ত্ত এবং নানা প্রকার আবর্জ্জনারাশি রাখিয়া দেন। তদ্দ্বারা বায়ু দূষিত হয়, সুতরাং তাহাতে অনেকেই পীড়িত হইয়া পড়েন।

এদেশে যে কুৎসিত প্রণালীতে সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হয়, তাহাতে বায়ু গমনাগমনের পথ থাকে না। তথাকার ভূমিও নিতান্ত আর্দ্র থাকে। এরূপ গৃহ, সকল সময়েই অস্বাস্থ্য-কর, বিশেষতঃ বর্ষাকালে নিতান্ত পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। সুস্থকায়, সবল ব্যক্তিরা এরূপ গৃহে বাস করিলে অল্পকালের মধ্যেই পীড়িত হইয়া পড়েন; কিন্তু এদেশের প্রসূতি ও সদ্যোজাত সন্তানেরা এরূপ দুর্ভাগ্য, যে তাহাদিগকে তথায় বাস করিয়া নানা প্রকার ক্লেশকর রোগ ও অকাল মৃত্যুর হস্তে পতিত হইতে হয়। আমরা, প্রাচীন কুপ্রথার অনুগামী হইয়া এই বিষয়ে কত গুরুতর অপরাধ করিতেছি, তাহা বর্ণন করা যায় না। দেশস্থ ভদ্রলোকেরা মনোযোগ না করিলে, ইহার প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই *।

---

* বাবু শিবচন্দ্র দেব প্রণীত "শিশু পালন" গ্রন্থ পাঠ করিলে, প্রসূতি ও শিশু সন্তানদিগের স্বাস্থ্য রক্ষার বিশেষ নিয়মাদি অবগত হইতে পারিবেন।

৮ম অধ্যায়।

ব্যায়াম।

জগদীশ্বর আমাদের শরীর পরিশ্রমোপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শরীরের যে অঙ্গ উপযুক্ত রূপে সঞ্চালিত হয়, তাহা বর্দ্ধিত পুষ্ট ও শ্রমক্ষম হইয়া উঠে, আবার সঞ্চালিত না হইলে তাহারা দুর্ব্বল, শীর্ণ ও শিথিল হইয়া যায়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যে অঙ্গ যত পরিচালিত হয়, তাহা তত শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। সেই ক্ষতি নিবারণ জন্য, তদভিমুখে শীঘ্র শীঘ্র রক্ত-সঞ্চার হয়, তাহাতে তাহারা পুষ্ট হইতে থাকে। যে রক্তদ্বারা শরীরের ক্ষতি নিবারণ হয়, সেই রক্ত আবার ভুক্ত অন্ন হইতে গৃহীত হয়। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে পরিমাণে আহার করিলে সুস্থ থাকা যায়, তৎপরিমিত পরিশ্রম করাই উচিত। তাহার অধিক পরিশ্রম করিলে, ভুক্ত অন্নদ্বারা আর সম্পূর্ণ রূপে শরীরের ক্ষয় নিবারণ হয় না; সুতরাং অতিরিক্ত পরিশ্রম বশতঃ শরীর দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

অঙ্গ বিশেষ যে, পরিশ্রম দ্বারা সবল ও বর্দ্ধিত হয়, সচরাচর ইহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। যান-

বহন করিয়া বেহারাদিগের স্কন্ধ দেশ স্থূল ও মাংসল হইয়া উঠে, ও নৌকা চালনদ্বারা মাজীদিগের হস্তাদির পেশী সকল সংবর্দ্ধিত হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। পদাতিক ডাক্ হরকরা বা পত্রবাহকেরা, সর্ব্বদা পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া থাকে, এজন্য তাহাদের পদ দেশের পেশী সকল বিলক্ষণ শক্ত ও স্থূল দেখা যায়। আবার যাহারা কোন প্রকার পরিশ্রম করে না, তাহাদের শরীর নিতান্ত কোমল ও শিথিল হইয়া যায়; তাহাদের অস্থি সমূহ এত কোমল, যে সামান্য ছুরিকা দ্বারা অনায়াসে দ্বিখণ্ডিত হইতে পারে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, কোন অঙ্গ-চালনার ইচ্ছা হইলে, সেই ইচ্ছা মস্তিষ্ক দ্বারা উক্ত অঙ্গের স্নায়ুতে বিজ্ঞাপিত হয়; তৎক্ষণাৎ আবার সেই স্নায়ুর বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত অঙ্গের পেশী সঙ্কুচিত হয়, তাহাতেই অঙ্গসঞ্চালন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। অতএব, অঙ্গ-চালনা বিষয়ে ইচ্ছাই একমাত্র প্রবর্ত্তিকা। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেরূপ পরিশ্রম করিলে, মনের ক্লেশ হয় না, তাহা অতি সহজে করা যাইতে পারে। অনিচ্ছার সহিত কর্ম্ম করিতে গেলে, মনের স্ফূর্ত্তি থাকে না, সুতরাং স্নায়ু সকল আবশ্যকমত কার্য্য করে না, তাহাতে অল্প ক্ষণের মধ্যে অঙ্গ সকল ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এজন্য প্রফুল্ল মনে পরিশ্রম করা উচিত। আন্তরিক

যত্ন থাকিলে, লোকে কত পরিশ্রম করিতে পারে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। শুনা গিয়াছে, প্রসিদ্ধ নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট, উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া, ৬ ঘণ্টায় ১২০ মাইল পথ অশ্বারোহণে গমন করিয়া ছিলেন। অর্থ লোভে কোন কোন দুস্যদল ১০।১২ ঘণ্টার মধ্যে পদব্রজে ৩০ ক্রোশ পথ ভ্রমণ ও সঙ্কল্পিত কার্য্য সাধন করিয়াছে, সচরাচর এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

পরিশ্রম বিষয়ে অভ্যাসই প্রধান। কোন কোন ব্যক্তি অল্প পরিশ্রম করিয়াই শ্রান্ত হইয়া পড়ে; কেহ বা তদপেক্ষা ১০।১৫ বা ২০ গুণ শ্রম করিয়াও ক্লিষ্ট হয় না। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিলে, অধিক পরিশ্রম সহ্য হইয়া উঠে। বলবান ব্যক্তিরা, দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের অপেক্ষায় অধিক পরিশ্রম করিতে পারে; ও দুর্ব্বল ব্যক্তিরাও পরিশ্রম করিতে করিতে, ক্রমে সবল হইয়া উঠে। কোন কোন রোগ, শুদ্ধ নিয়মিত পরিশ্রম দ্বারা দূরীভূত হইয়া থাকে।

যেমন, নিয়ত পরিচালিত হইলে অঙ্গ বিশেষের বল বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ সমুদায় শরীরের সঞ্চালন হইলে, সমস্ত শরীরের বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন শারীরিক পরিশ্রম করিলে শরীর শক্ত হয়, সেইরূপ আবার মানসিক পরিশ্রম করিলে মনোবৃত্তি সতেজ হইয়া উঠে। শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রমই এক নিয়-

ণের অধীন। অতিরিক্ত হইলে, দুয়েতেই অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

পদব্রজে ভ্রমণ করা অতি অল্পায়াস সাধ্য। প্রত্যহ প্রত্যূষে এক বা সার্দ্ধ ক্রোশ বেড়ান উচিত। ২।৩ জন আত্মীয় একত্রে বেড়াইলে মন প্রফুল্ল থাকে, সুতরাং অধিক শ্রান্তিবোধ হয় না। বেড়াইবার সময় হস্ত ও বক্ষস্থল স্থিরভাবে না রাখিয়া, কিয়ৎপরিমাণে ইতস্ততঃ চালনা করা উচিত। অতি দ্রুতবেগে বেড়াইলে কোন কোন ব্যক্তির পীড়া উপস্থিত হয়। সবল ও সুস্থ শরীরেই দ্রুত গমন ক্লেশকর নহে।

অশ্বারোহণে বেড়াইলে শরীরের অনেকাংশের সঞ্চালন হয়। ইহাতে বিলক্ষণ উপকার আছে।

সন্তরণ ও দৌড়ান, অনেক সময়ে পীড়াদায়ক হয়। সন্তরণ কালে দেহস্থ রক্ত, মস্তিষ্কাভিমুখে অধিক পরিমাণে ধাবিত হইয়া শিরোরোগ উৎপাদন করে ও কখন কখন আসন্ন মৃত্যুও উপস্থিত করিয়া থাকে। দৌড়াইবার সময়, রক্তের গতি অতি দ্রুত হয়; বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বে হাত দিলেই হৃদয়ের কার্য্যের সত্বরতা অনুভব করা যায়। দৌড়াইলে ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকে; তাহা অধিক কাল থাকিয়া গেলে, হৃদয় বা ফুস্‌ফুসের রোগ জন্মে। অবশেষে মৃত্যুও হইতে পারে।

এতদ্দেশের ও ইংলণ্ডের মল্লগণ নানা প্রকার

ব্যায়াম করিয়া থাকেন। তৎসমুদায় প্রয়োজনীয় বটে; কিন্তু তাহাদের দ্বারা শরীর এরূপ কষ্টকর কার্য্যে ব্যাপৃত হয়, যে কখন কখন প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

মানসিক পরিশ্রম দ্বারা মনুষ্য নামের যথার্থ গৌরব সাধন হয়। যে সকল আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া, মনুষ্য জাতি পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর হইয়াছেন, তৎসমুদায়ই ইহার দ্বারা সাধিত। মনুষ্যের মানসিক শক্তি ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে, ইহার বৃদ্ধির সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না। যে মানসিক পরিশ্রম মনুষ্যের পক্ষে এত উপকারী, তাহা হইতে বিমুখ হইলে পশু সদৃশ হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইতে হয়। শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রম যথা নিয়মে না করিলে স্বাস্থ্য ও বিবেক শক্তি রক্ষা হয় না। উভয়ই আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এতদ্দেশের অনেকেই বিবেচনা করেন যে, পাঠশালায় বিদ্যা-শিক্ষার সময়ই মানসিক পরিশ্রমের প্রকৃত কাল; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র আমরা মানসিক পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করি, ও মৃত্যু-শয্যায় শয়ান হইয়া তাহা হইতে বিরত হই। এই কালের মধ্যে বিদ্যা-শিক্ষা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কার্য্য-দক্ষতা লাভ, পরস্পরের কর্ত্তব্যাবধারণ,

ইত্যাদি যে সকল কার্য্যে আমরা ব্যাপৃত থাকি, তৎসমুদায় মানসিক-শ্রম-সাধ্য। এক্ষণে, পৃথিবীর অনেক লোকেই, শুদ্ধ শারীরিক পরিশ্রম করিয়া কথঞ্চিৎ রূপে জীবন ধারণ করিতেছেন; মানসিক শ্রম করিবার প্রবৃত্তি ও অবকাশ অভাবে, তাঁহাদিগের বুদ্ধি-শক্তি নিতান্ত হীনাবস্থায় রহিয়াছে। এ দেশের স্ত্রীদিগের অবস্থাও এই রূপ। বিদ্যাভাবে ইহারা, ইহলোকের মঙ্গল সাধন ও আপনাদের অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিতেছে না। অন্যে দয়া করিয়া যাহা কিছু দান করে, তাহাতেই সন্তুষ্ট রহিয়াছে। কোন কোন লোক, স্বাবলম্বিত ব্যবসায়ের দোষে নিতান্ত নির্ব্বোধ হইয়া পড়ে। যাজনোপজীবী ব্রাহ্মণ, মন্ত্রদাতা গুরু, কোম্পানির কাগজওয়ালা মহাজন, রাজকোষ হইতে বৃত্তি ভোগী ব্যক্তি, সামান্য কেরাণী, ক্ষুদ্র দোকানদার, কৃষক প্রভৃতিকে প্রত্যহ একই নিয়মে দিন যাপন করিতে হয়; ইহাদের মনে, কোন অভিনব চিন্তার উদয় প্রায়ই হয় না। এই কারণ বস্তুতঃ এই কয়েক শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে, অনেক অল্পবুদ্ধি লোক দেখা যায়।

[illegible] ঘণ্টা কাল মানসিক পরিশ্রম করিয়া ১ ঘণ্টা কাল বিরাম করা উচিত। ক্রমাগত ১০।১২ ঘণ্টা মানসিক পরিশ্রম করিলে পীড়া উপস্থিত হয়। পাঠাবস্থায় অনেকে রাত্রি জাগরণ করিয়া, একাসনে ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম

করিয়া নানা প্রকার রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। অল্প-কালের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি ও যশোলিপ্সু হইয়া তাঁহারা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করেন; কিন্তু অভি-লষিত ফল পাইবার পূর্ব্বেই পীড়িত হইয়া পড়েন, অথবা তাহা প্রাপ্ত হইয়াও ভোগ করিতে সমর্থ হন না। যাঁহারা এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তন্মধ্যে অনেকেরই এই রূপ ঘটে।

নিয়মিত পরিশ্রম করিলে, কার্য্য সাধন করিতে অধিক সময় লাগিবে, এই আশঙ্কায় যশঃপ্রার্থী লোকেরা দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করিয়া ৫ বৎসরের কাজ এক বৎসরে সম্পন্ন করিয়া থাকেন; এরূপ করাতে, হয়ত সঙ্কল্পিত কার্য্য শেষ করিয়া তুলিবার পূর্ব্বেই নিতান্ত রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হন, অথবা অতি ক্লেশে আকাঙ্ক্ষিত যশোলাভ করেন। কিন্তু ইহাতে হয়ত ৩০।৩৫ বৎসর বয়ঃক্রম না হইতে হইতেই শরীরে বার্দ্ধক্য ও জরার সমুদায় লক্ষণ উদয় হয়; তখন, পরিক্লিষ্ট আত্মা, ভগ্ন-দেহে অবস্থিতি করিতে অপারগ হইয়া, ত্বরায় পরলোকে প্রস্থান করেন।

৯ম অধ্যায়।

নিদ্রা।

নিয়ত পরিশ্রম করিলে শারীরিক যন্ত্র সকল দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এজন্য তাহাদের বিশ্রামকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। ক্রমাগত ১০।১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে করিতে প্রথমতঃ দৌর্ব্বল্য দেখা দেয়, ইতস্ততঃ গমনাগমনে অনিচ্ছা হয়, ইন্দ্রিয়গণ ইচ্ছার আয়ত্ত থাকে না, ও অবশেষে মনোবৃত্তি সকল এরূপ অবস্থাপন্ন হয়, যে তাহারা কোন কার্য্যই করিতে পারে না। তখন শ্রান্তিহারিণী নিদ্রা উপস্থিত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হরণ করিয়া ফেলে। পরিশ্রান্ত ও শোকতাপাকুলিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, নিদ্রা যেরূপ মহোপকারিণী তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। ফলতঃ নিদ্রা না হইলে আমাদের নানা রোগ ও অচিরাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

রাত্রিকাল নিদ্রার প্রকৃত সময়। দিবসে নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া শরীর ক্লান্ত হইলে, নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রার আবির্ভাব হয়। যাহারা পরিশ্রমবিমুখ, তাহারা বহু ব্যয় করিয়াও সুনিদ্রা রূপ অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইতে পারে না। কেহ কেহ আবার, এরূপ

দুর্ভাগ্য যে দিবাভাগ নিদ্রায় অতিপাতিত করেন, ও রাত্রিকালে নিতান্ত অস্থির হইয়া নানা প্রকার কৃত্রিম উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক নিদ্রাকে আহ্বান করেন; কিন্তু এরূপ লোকের কখনই সুনিদ্রা হইবার সম্ভাবনা নাই।

শরীর সুস্থ না থাকিলে সুনিদ্রা হয় না। তখন নানা প্রকার স্বপ্ন উপস্থিত হইয়া ক্লেশদায়ক হইয়া উঠে। অজীর্ণ দোষ নিদ্রার অতিশয় প্রতিবন্ধক; এজন্য নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে গুরুতর ভোজন করা অন্যায়।

শয়নের পূর্ব্বে ক্রোধ, দ্বেষ, বিরক্তি প্রভৃতি ক্লেশকর ভাবোদয় হইলে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে; এজন্য তৎসমুদায় পরিত্যাগ করা উচিত। তৎকালে আমোদ প্রমোদ করিয়া সকৃতজ্ঞ-চিত্তে জগদীশ্বরের মহিমা চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলে, যেরূপ সুখী হওয়া যায় এরূপ আর কিছুতেই হয় না।

শয়নের পূর্ব্বে, হস্ত পদ ও মুখ ধৌত করিয়া, তোয়ালে বা মোটা কাপড় দিয়া গাত্রমার্জ্জন করা উচিত। তখন ফ্লানেল প্রভৃতি কাপড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যে পরিমাণে কার্পাসের কাপড় ব্যবহার করিলে শীত নিবারণ হয়, তাহা দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করা বিধেয়।

আমাদের শয্যা নিতান্ত কঠিন বা কোমল হইলে,

নানা প্রকার দোষ ঘটে। শিশুদিগের শয্যা অপেক্ষাকৃত কোমল হওয়া আবশ্যক।

বাম বা দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করা উচিত। চিত হইয়া শয়ন করিলে বক্ষঃস্থলে দুরূহ ভার বোধ হয়, ও নানা প্রকার ভয়ানক স্বপ্ন উপস্থিত হইয়া সুনিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়। ইহাকেই লোকে "বুক-চাপা" বলে। রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত হওয়াতেই এই ক্লেশকর পীড়া উপস্থিত হয়, এবং ইহাতে কোন কোন ব্যক্তির মৃত্যুও হইয়া থাকে।

শয়নকালে গাত্রাবরণ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু তাহা অতিরিক্ত পরিমাণে ধারণ করিলে, শরীর উত্তপ্ত হয় এবং ঘর্ম্ম-নিঃসরণ হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়া ফেলে। নিদ্রাকালে, গাত্রবস্ত্র দ্বারা মুখ নাসিকাদি আবৃত রাখা অন্যায়। এরূপ করিলে, পুনঃ পুনঃ প্রশ্বসিত দূষিত-বাষ্প গ্রহণ করিতে হয়; তাহাতে পীড়া ও মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

শয়ন গৃহে বায়ু-সঞ্চালনের বিশেষ পথ রাখা উচিত। কেহ কেহ রাত্রি কালীন বায়ুকে এত ভয় করেন, যে তাহা কোনমতেই গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে, নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠেন। এমন কি, জানালা ও দ্বারের সন্ধিস্থানে অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকিলেও, তাহা তুলা বা ছিন্নবস্ত্রদ্বারা

রোধ করিয়া থাকেন। এদেশে এত সশঙ্ক হইবার প্রয়োজন নাই। এরূপ করিলে কেবল বায়ু গমনাগমনের পথ রোধ করা হয় এই মাত্র।

এদেশে শীতকালে ৭।৮ ঘণ্টা ও গ্রীষ্মকালে ৬।৭ ঘণ্টা নিদ্রা গেলেই যথেষ্ট হয়। যাহারা নিতান্ত রুগ্ন বা দুর্ব্বল, তাহাদের অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ের প্রয়োজন। অভ্যাসানুসারে নিদ্রার সময় নির্দ্ধারণ করা উচিত। কেহ কেহ আহার করিবা মাত্র নিদ্রাকৃষ্ট হন, অন্য কেহ কিয়ৎকাল পরে নিদ্রা যাইয়া থাকেন। গ্রীষ্মকালে ১০টা ও শীতকালে ৯½ টার সময় শয়ন করিয়া, প্রত্যূষে উঠিলেই যথেষ্ট হয়।

---

১০ ম অধ্যায়।

মনোবৃত্তি।

শরীর ও মনের যেরূপ নিকট সম্বন্ধ তাহা এই পুস্তকের স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। শরীর রুগ্ন হইলে মনোবৃত্তি সকল বিকৃত হইয়া যায়, ও মানসিক কষ্ট হইলে শরীর অসুস্থ হয়, তাহা অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। ক্ষুধাকালে ক্রোধ, শোক প্রভৃতির উদয় হইলে তৎক্ষণাৎ ক্ষুধা অন্তর্হিত হয়। কেহ কেহ প্রবল চিন্তাবেগে, ২।৩ দিন অনাহারী থাকেন।

মনোবৃত্তি সকল সর্ব্বদা উত্তেজিত হইলে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়; অতএব যাহাতে মনে কোন উপদ্রব না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। দেখা গিয়াছে, যাহারা সর্ব্বদা রাগ দ্বেষাদির বশীভূত, তাহারা দীর্ঘজীবী হয় না।

যাহারা সর্ব্বদা প্রসন্ন ও প্রফুল্ল মনে থাকেন, তাঁহারা অধিক পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত হন না। ভোজনকালে আমোদ প্রমোদ করিলে, অতি শীঘ্র পরিপাক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়।

মনুষ্যদিগের নানা প্রকার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে। তৎসমুদায় প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু তাহাদিগের বশীভূত হইলে পশুতুল্য হইতে হয়। এই সকল বৃত্তি প্রবল হইলে, শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার শক্তিরই হ্রাস হয়, ও পরিশেষে রোগ পরম্পরা উপস্থিত হইয়া প্রাণ সংহার করে।

সমাপ্ত।

Printed by J. G. Chatterjea & Co.